মোহানার দিকে

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্য সংস্থা

১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
মনধীর পাল
১৪ এ টেমারলেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রণ
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১।১, দিনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

স্নেহের শান্তিকে

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

আকাশের তেলতেলে ঢালু গা বেয়ে প্রকাণ্ড সোনালী বলের মতো গড়াতে গড়াতে সূর্যটা যখন পশ্চিমে অনেকখানি নেমে গেছে ঠিক সেই সময় জেলখানার ভারী লোহার গেটটা ঝড়াং ঝড়াং শব্দ করে খুলে গেল। খুব আস্তে, ক্লান্তভাবে পা ফেলে ফেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সুশোভন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু চোখ ধাঁধিয়ে গেল যেন।

এখন দুপুরও না, আবার বিকেলও না। দিনটা দুইয়ের মাঝখানে ঝিম মেরে আছে।

সময়টা নভেম্বরের শেষাশেষি; বাংলা ক্যালেণ্ডারে খুব সম্ভব অগ্রান মাস অর্থাৎ হেমন্তকাল। এর মধ্যেই উত্তুরে হাওয়া দিতে শুরু করেছে; তার সর্বাঙ্গে হিমের গুঁড়ো মেশানো। এই বাতাসে গায়ে কাঁটা দেয়।

ক'দিন আগেও রোদটা ছিল দারুণ তেজী আর ঝকঝকে—নতুন ছুরির মতো ধারালো। তার রঙ একেবারেই বদলে গেছে। বাসী হলুদের মতো রোদটা এখন ম্যাড়মেড়ে, নির্জীব। টের পাওয়া যাচ্ছে শীতটা এবার অনেক আগে আগেই পড়ে যাবে।

বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। পেছনে ভারী জেল-গেটটা কর্কশ আওয়াজ তুলে আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

রোদের চেহারা এখন যেমনই হোক চারদিকের অজস্র আলো সুশোভনের চোখে হাজারটা ছুঁচ বিঁধিয়ে দিতে লাগল। তাঁর পরিষ্কার মনে আছে আট বছর বাদে একসঙ্গে এত আলো তিনি দেখলেন।

সুশোভন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনের দিকে কংক্রীট অ্যাসফাল্টে মোড়া বিশাল কলকাতা শহর, মাথার ওপর

আকাশের প্রকাণ্ড চাঁদোয়া। কতকাল পর তিনি এই বিরাট শহরের মাঝখানে সীমাহীন আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালেন।

জেলের উঁচু উঁচু পাঁচিলগুলোর ভেতর আটটা বছর কেটে গেছে সুশোভনের। তিনি খুনের আসামী; নিজের স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে তাঁর জেল হয়েছিল। এই আটটা বছর পৃথিবী তাঁর কাছে কয়েদখানার সিকি বর্গমাইল ফ্রেমের মধ্যে গুটিয়ে এসেছিল যেন। আলো-হাওয়া-আকাশ, সবকিছু তিনি ওই মাপেই পেয়েছেন।

আট বছর পর আচমকা জেলের বাইরে এসে বিরাট মাপের আকাশ আর এত অজস্র আলো-হাওয়া সহ্য করতে পারছিলেন না সুশোভন। অনেকক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আলো-টালো আস্তে আস্তে চোখে সয়ে এলে আশেপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন।

জেল-গেটের কাছে থোকা থোকা মানুষের ভিড়। কিন্তু একটা চেনা মুখও সুশোভনের চোখে পড়ল না। পড়ার কথাও নয়। আদালতের ভাষায় বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল তাঁর। আরো চারটে বছর তাঁর জেলে কাটানোর কথা। কিন্তু সুশোভনের জেল-কনডাক্ট অর্থাৎ কয়েদখানায় তাঁর আচরণ অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে এত আগেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

আজ যে ছেড়ে দেওয়া হবে, ক'দিন আগেই সুশোভনকে তা জানানো হয়েছিল। ইচ্ছা করলে খবরটা তিনি অমু-সমুদের পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু খবর পাঠালেই কি তারা আসত? মলিন একটু হাসলেন সুশোভন। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুশোভনের বয়স বাহান্ন-তিপ্পান্ন। দীর্ঘ টানটান চেহারা। জোড়া ভুরুর নিচে মাঝারি ধরনের বিষণ্ণ চোখ। লম্বাটে মুখে খাঁজ-কাটা থুতনি, ঈষৎ ভারী ঠোঁট। তাঁর কাঁধ বেশ চওড়া; হাত হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। মাথার চুল অর্ধেক কালো, বাকিটা রুপোর তার।

এই মুহূর্তে সুশোভনের মুখে চাপ চাপ কাঁচা-পাকা

পলক তাকিয়েই টের পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সেই সঙ্গে অদ্ভুত ক্লান্তি বা বিষাদও লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ হয়ত একটানা দীর্ঘ কারাবাস।

সুশোভনের পরনে বহুকালের পুরনো ঢোলা ট্রাউজার আর শার্ট, পায়ে চপ্পল। পকেটে কুড়ি-পঁচিশটা টাকা রয়েছে। আট বছর আগে এগুলো জেল-সুপারিনটেনডেণ্টের অফিসে জমা দিয়ে তিনি জেলখানায় ঢুকেছিলেন। আজ তাঁর যাবতীয় জিনিসপত্র পুরনো রেকর্ড মিলিয়ে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

জেল-গেট থেকে কয়েক পা দূরে অ্যাসফাল্টে-ঢাকা ঝকঝকে রাস্তা ; তার মাঝখান দিয়ে ট্রামের লাইন পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি চলে গেছে।

আজ রবিবার ; ছুটির দিন। তবু রাস্তায় প্রচুর লোকজন ; অগুনতি গাড়ি-টাড়িও চোখে পড়ছে। প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি কি লরী-টরি উত্তুরে বাতাসে ঝড় তুলে হুস হুস ছুটে যাচ্ছে।

দূরমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা পেরিয়ে ওধারের ট্রাম স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালেন সুশোভন। এখন তিনি কোথায় যাবেন ? বরানগরেই কি ? এতকাল বাদে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে অমু-সমুরা তাঁকে কিভাবে নেবে ? ওদের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর মোটামুটি ধারণা আছে। ভেতরে ভেতরে সুশোভন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। দ্বিধান্বিতের মতো ভাবলেন, যাবেন না। পরক্ষণে বুবুনের মুখটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আগের সিদ্ধান্তটা তিনি নাকচ করে দিলেন। নাঃ, বরানগরে তাঁকে একবার যেতে হবেই।

বুবুন এখন কত বড় হয়েছে ? আট বছর আগে যখন তাকে সুশোভন শেষবার দেখেছিলেন তখন তার বয়স পনের। এখন সে নিশ্চয়ই তেইশ বছরের পূর্ণ যুবক। না বলে দিলে তিনি কি আর ওকে চিনতে পারবেন ?

মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ট্রাম এসে সুশোভনকে টপ করে তুলে নিল। ট্রামে খুব একটা ভিড়-টিড় নেই। এক কোণে একটা খালি সীটে জানালার ধার ঘেঁষে বসে পড়লেন সুশোভন।

ট্রামটা ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দারুণ স্পীড তুলে ছুটে যাচ্ছিল।

কখন খিদিরপুরের ব্রিজ পেরিয়ে রেসকোর্স ছাড়িয়ে ট্রামটা ময়দানের ভেতর এসে পড়েছে, সুশোভনের খেয়াল নেই। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, রোদের রঙ আরো ঘন হয়ে গেছে। উত্তুরে বাতাসে হিমের কণা আরো বেশি করে মিশে যাচ্ছে। শিমূল তুলোর আঁশের মতো ফিনফিনে কুয়াশা এরই মধ্যে জমতে শুরু করেছে।

অনেক দূরে, ময়দানের ওপারে কলকাতার নতুন স্কাই লাইন চোখে পড়ছে। বিরাট বিরাট সব মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং সোজা উঠে গিয়ে আকাশের গায়ে বিঁধে আছে যেন। আট বছর আগে চৌরঙ্গীর এই স্কাই স্ক্রেপার কমপ্লেক্সটা ছিল না। কলকাতাকে আশ্চর্য নতুন আর অচেনা লাগছে সুশোভনের।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রামটা এসপ্ল্যানেডে এসে পড়ল। এই জায়গাটাও অনেক বদলে গেছে। আট বছর খুব কম সময় নয়।

ট্রাম থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন সুশোভন। তাঁর মনে হতে লাগল, পৃথিবীর দূর প্রান্তের কোন টুরিস্টের মতো এক আধ-চেনা জগতে তিনি বেড়াতে এসেছেন।

বিস্ময়ের ভাবটা একটু থিতিয়ে এলে হাঁটতে হাঁটতে সুশোভন স্টেট বাসের টারমিনাসে চলে এলেন। কত নম্বর বাস যেন বরানগরে যায়? এত কাল বাদে মনে করা গেল না। তাঁর স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বাসের স্টার্টারদের যে শেডগুলো আছে সেখানে জিজ্ঞেস করতেই নম্বরটা পাওয়া গেল। সেই নম্বর দেখে একটা বাসে উঠে বসলেন সুশোভন।

বাসটা যখন বরানগরে বি. টি. রোডের ধারে সুশোভনকে নামিয়ে দিল, হেমন্তের দিন ফুরিয়ে এসেছে। মিনিট পনের আগেই সূর্য ডুবে গিয়েছিল। কালচে ছায়া ছড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে আসতে সুরু করেছে। এখনও চারদিক গাঢ় অন্ধকারে মুড়ে যায় নি। গোটা বরানগর যেন একটা উলঙ্গবাহার শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বসে আছে।

বি. টি. রোড থেকে বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরে মিনিট ছয়-সাতেক হাঁটলেই বাড়ি। অন্যমনস্কের মতো সেদিকে যেতে যেতে সুশোভনের চোখে পড়ল রাস্তায় গাড়ির স্রোত। বাস-টেম্পো-মিনি বাস আর প্রাইভেটকার—সব ঢলের মতো বয়ে যাচ্ছে। তার ওপর রয়েছে বিরাট বিরাট ট্রাকের কনভয়। এই ট্রাকগুলো মহারাষ্ট্র থেকে, হরিয়ানা থেকে, তামিলনাড়ু কি কেরল থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এখন উর্ধ্বশ্বাসে কলকাতার দিকে দৌড় লাগিয়েছে।

রাস্তায় যত গাড়ি-টাড়ি তার দশ-পনের গুণ মানুষ দেখা যাচ্ছে। জেল থেকে বেরুবার পর অনবরত থিকথিকে ভিড়ই চোখে পড়ছে সুশোভনের। শুধু মানুষ আর মানুষ। আট বছরে কত লোক বেড়েছে কলকাতায় ? তিন গুণ, চার গুণ ? 'পপুলেসন এক্সপ্লোসন' বলে একটা কথা তাঁর জানা ছিল। চারদিকে তাকিয়ে আবছাভাবে সেটা মনে পড়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে আবো একটা ব্যাপার চোখে পড়ছিল সুশোভনের। আট বছরে কলকাতার এই শহরতলিও কলকাতার মতোই বদলে গেছে। আগে এখানে ফাঁকা জায়গা ছিল বেশি ; বাড়িঘর কম। এখন কোথাও এক সঙ্গে দশ ফুট জমি খালি পড়ে নেই। গাদা গাদা নতুন বাড়ি জীবাণুর মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে।

নভেম্বরের ঝাপসা সন্ধ্যায় জায়গাটা চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল সুশোভনের। দু-ধারে অনেক নতুন দোকান-টোকান হয়েছে। তালুকদার ব্রাদার্স'র মনিহারী দোকান, দি গ্রেট পূর্ণলক্ষ্মী লণ্ড্রি, পরিতোষ ডাক্তারের ডিসপেন্সারি আট বছর আগেও ছিল। বাকি কুড়ি-বাইশটা দোকান একেবারে নতুন।

রাস্তায় যে সব লোকজন দেখা যাচ্ছে তাদের বেশিরভাগই অচেনা। দু-চারটে পরিচিত মুখও চোখে পড়ছে। চেনা মুখ দেখলেই ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন সুশোভন। অবশ্য হেমন্তের এই ঝাপসা সন্ধ্যায় কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছিল না।

শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাড়িটা খুঁজে বার করলেন সুশোভন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেতরে ঢুকলেন না; উঁচু লোহার গেটটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ষাট সত্তর বছর আগে গথিক স্ট্রাকচারের মোটা মোটা থামওলা এই প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটা করিয়েছিলেন ঠাকুরদা। আট বছর আগের মতো সেটা প্রায় অবিকল সেই রকমই আছে। তবে দরজা জানালা এবং দেয়ালে টাটকা রঙ লাগানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বাড়িটাকে ঘিরে সাত ফুট উঁচু কম্পাউণ্ড ওয়াল। সামনের দিকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা।

এই মুহূর্তে সুশোভনের চোখে পড়ল বাড়ির বিরাট ছাদ জুড়ে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। সামনের ঘাসের জমিটার একদিকে সাটিনের ঝালর-লাগানো চমৎকার একটা মেরাপ দেখা যাচ্ছে। তার তলায় এক-একটা টেবিল ঘিরে চারটে চারটে করে চেয়ার সাজানো।

গোটা বাড়িটায় এখন শুধু আলো আর আলো। দেয়ালে-কার্নিসে-থামে কিংবা মেরাপের গায়ে হাজার হাজার টুনি লাইট চুমকির মতো জ্বলছে। লাল-নীল-সবুজ, নানা রঙের আলোর ফোয়ারার মাঝখানে বাড়িটা যেন ভাসছিল। গেটের কাছে উঁচু নহবত বসানো হয়েছে; সেখানে সানাই বেজে যাচ্ছে।

একতলা দোতলা কিংবা সামনের মেরাপে প্রজাপতির ঝাঁকের

মতো সুন্দরী মেয়েরা যেন উড়ে বেড়াচ্ছে, আর হাজারটা ঝর্নার শব্দ তুলে একেক বার হেসে উঠছে। আর রয়েছে সুন্দর পোশাক-পরা বাচ্চারা। এ ছাড়া পুরুষদেরও দেখা যাচ্ছে ; তারা ব্যস্ত পায়ে ওপরে-নিচে ছোটাছুটি করছিল।

দেখেই বোঝা যায় বিয়ে বাড়ি ; কিন্তু কার বিয়ে ? সুশোভন ভেবে পেলেন না। তাঁকে না জানিয়ে বাড়িতে এত বড় উৎসব হচ্ছে, এটা চিন্তা করা যায় না। হঠাৎ অদ্ভুত এক কষ্ট অদৃশ্য ঘুণ পোকার মতো তাঁর বুকের ভেতর যেন শিরা কাটতে লাগল।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁকা চোখে বিয়ে বাড়ির আলোকোজ্জ্বল উৎসবের দৃশ্য দেখলেন সুশোভন। তারপরেই আচমকা তাঁর চোখ পড়ল গেটের গায়ে ডান দিকের মোটা পিলারটার ওপর। সেখানে কাঠের পুরনো নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে প্রফেসর অবনীমোহন ব্যানার্জী, এম-এ, পি-এইচ-ডি। নামটা রোদে-জলে অস্পষ্ট হয়ে গেছে ; বেশ কষ্ট করে পড়তে হয়। অবনীমোহন সুশোভনের বাবা।

বাবার নেমপ্লেটের তলায় পেতলের আরেকটা ঝকঝকে নেমপ্লেট রয়েছে। তার ওপর এনগ্রেভ করে ইংরেজিতে তিনটে নাম লেখা আছে। ডাক্তার অমরেশ ব্যানার্জী, এম-বি. বি-এস, সমরেশ ব্যানার্জী, বি-ই এবং দিবাকর ব্যানার্জী, ডব্লু-বি-সি-এস। অমরেশ, সমরেশ আর দিবাকর সুশোভনের ছোট তিন ভাই। তাদের ডাক নাম অমু সমু এবং দিবু।

একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন নামগুলো দেখতে লাগলেন সুশোভন। তাঁর মনে পড়ল আট বছর আগে বাবার নেমপ্লেটের তলায় অমু-সমুদের নাম ছিল না ; তার বদলে একটা কালো প্ল্যাস্টিকের নেমপ্লেটে সাদা হরফে লেখা ছিল সুশোভন ব্যানার্জী, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। তাঁর নামটা পিলারের গা থেকে কবে ওরা তুলে ফেলেছে কে জানে। এ বাড়ি থেকে তিনি কি চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেছেন ?

বিষণ্ণ একটু হাসলেন সুশোভন। তারপর উঁচু নহবতের তলা দিয়ে ক্লান্তভাবে পা ফেলে ফেলে ভেতরে ঢুকলেন। ক'পা গেছেন, হঠাৎ

কোথেকে ছুটতে ছুটতে অমরেশ সামনে এসে দাঁড়াল। তার পেছন পেছন সমরেশ আর দিবাকরও।

প্রথমটা চিনতে অসুবিধা হয়েছিল সুশোভনের। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অবশ্য চিনে ফেললেন।

আট বছর আগে ওদের চেহারা ছিল বেতের মতো ধারালো আর ছিপছিপে; কারো গায়েই এক গ্রাম বাজে ফ্যাট ছিল না। ক'বছরে ওরা প্রত্যেকেই আড়াই তিন গুণ মোটা হয়েছে। সবারই ঘাড়ে-পেটে-গলায় এবং চোখের নিচে প্রচুর চর্বি জমেছে।

সুশোভনকে বাদ দিলে বাকি তিন ভাই চেহারার দিক থেকে মামাবাড়ির ধাত পেয়েছে। একমাত্র সুশোভনই যা তাঁর বাবার মতো।

কত আর বয়েস হবে ওদের? সুশোভন মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, অমরেশের বড় জোর ছেচল্লিশ, সমরেশের তা হলে চুয়াল্লিশ আর দিবাকরের বেয়াল্লিশ। ওরা তিন ভাই দু'বছর পর পর হয়েছে।

মামাবাড়ির ধারা অনুযায়ী এই বয়সেই তিন ভাইয়ের মাথার আধাআধি জুড়ে টাক পড়েছে। এই টাক মেদ ইত্যাদি মিলিয়ে টের পাওয়া যাচ্ছে জীবনে ওরা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য নেমপ্লেটে ওদের নামের পেছনে যে দামী দামী চোখ-ধাঁধানো ডিগ্রিগুলো রয়েছে তার থেকে এর একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে এই প্রতিষ্ঠা তো সুশোভন নিজেই একদিন ওদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে।

এই মুহূর্তে ওদের সবারই পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। অঘ্রানের হিম-জড়ানো সন্ধ্যাতেও তিনজনের কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে; খুব সম্ভব বিয়ে বাড়ির ছোটাছুটি এবং খাটাখাটুনির জন্য।

অমরেশ একদৃষ্টে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর খুব চাপা গলায় বলল, 'দাদা তুমি!' তার চোখেমুখে অদ্ভুত এক ভয় আর অস্বস্তি।

সুশোভন লক্ষ্য করলেন এই ভয় এবং অস্বস্তিটা একা অমরেশেরই

নয়, সমরেশ আর দিবাকরেরও। ভেতরে কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগল তাঁর। তবু অনেকখানি আগ্রহ নিয়ে তিনি বললেন, 'অমু-সমু-দিবু, আজ ওরা আমাকে রিলিজ করে দিল। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু—'

'কী ?'

'এত লোকজন, এত আলো, সানাই, নহবত—কী ব্যাপার ? কারো বিয়ে মনে হচ্ছে !'

তিন ভাই সুশোভনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিকই, তবে সতর্ক-ভাবে চারদিকে চোখ রাখছিল। অর্থাৎ কেউ তাদেব দেখছে কিনা, সেটাই লক্ষ্য করছে। আগের মতো চাপা গলায় অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ—'

সুশোভন উৎসুকভাবে বললেন, 'কার বিয়ে রে ?'

এবার সমরেশ বলল, 'এদিকে এসো, বলছি—'

'কোথায় যাব ?'

যেখানে সাটিনের ঝালর-দেওয়া মেরাপ বাঁধা হয়েছে তার উল্টো-দিকে একরকম জোর করেই সুশোভনকে নিয়ে গেল সমরেশরা ; সেখান থেকে বাড়ির পেছন দিকে।

সুশোভন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এখানে নিয়ে এলি কেন ?'

সমরেশ বলল, 'বলছি। তার আগে আমাদের সঙ্গে চল—'

'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?'

'তোমার ঘরে।'

বাড়িটার পেছন দিকে আগাছার জঙ্গল, অন্ধকার। কম্পাউণ্ড-ওয়ালের গায়ে ছোট একটা খিড়কির দরজাও রয়েছে ; বারো মাস সেটা বন্ধই থাকে। এধারে বড় একটা কেউ আসে না।

পেছন দিক দিয়ে ওপরে ওঠার জন্য একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ছিল। অমরেশরা সুশোভনকে নিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সুশোভন বললেন, 'আমার ঘরে যাব তো, পেছন দিক দিয়ে নিয়ে এলি কেন ?'

দিবাকর এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবার সে বলল, 'এদিক দিয়ে না এনে উপায় ছিল না।'

সুশোভন বললেন, 'তোদের কাণ্ডকারখানা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ঘরে গিয়ে সব বলব।'

সুশোভন আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না ; বিমূঢ়ের মতো ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

দোতলায় এসে অমরেশ দিবাকরকে বললেন, 'যা তো দিবু, তোর মেজো বৌদির কাছ থেকে চাবি এনে দাদার ঘরটা খোল। দেখিস এদিকে কেউ যেন না আসে। আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি ; তুই ঘর খুলে খবর দিলে আমরা যাব।'

দিবাকর চলে গেল। অন্য দুই ভাইয়ের সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুশোভন। ভাইদের আচরণ, কথাবার্তা, সব কিছু তাঁর কাছে আশ্চর্য হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে। আচমকা বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনে পড়তে তিনি অমরেশ আর সমরেশের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে এখন রাত নেমে গেছে। অঘ্রানের কুয়াশা আর অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে। তবু তারই মধ্যে সোজাসুজি দুই ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ; ঠিক ঠিক উত্তর দিবি ?'

ভীতু গলায় অমরেশ সমরেশ বলল, 'কী কথা ?'

'আমি ফিরে আসাতে তোরা বোধহয় খুশী হোস নি, তাই না ?' সুশোভন পলকহীন তাকিয়ে রইলেন।

বিব্রতভাবে অমরেশরা বলে উঠল, 'না-না, তা কেন ?'

'তা হলে চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে নিয়ে এলি কেন ?'

অমরেশরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় দিবাকর ফিরে এসে বলল, 'ঘর খুলেছি।'

একটু পর তিন ভাইয়ের সঙ্গে সাড়ে আট বছর বাদে নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন সুশোভন। একটানা এতগুলো বছরের মধ্যে ছ' মাস তাঁর বিচার চলেছে; এই সময়টা তাঁকে জেল-হাজত আর পুলিস লক-আপে থাকতে হয়েছে। বাকি আট বছর কেটেছে জেলখানায়।

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল দিবাকর। সুশোভন দেখলেন তাঁর ঘরটা হুবহু আগের মতোই রয়েছে। পুরনো কালের সেই মকরমুখী ভারী খাট, লাইফ-সাইজ আয়না-বসানো আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সিলিং-এ চওড়া ব্লেডওলা নাইনটীন থার্টি মডেলের ফ্যান—কোন জিনিসেরই একচুল নড়চড় হয় নি। তা ছাড়া ঘরটা ঝেড়ে পুঁছে ঝকঝকে করেও রাখা হয়েছে।

অমরেশ বলল, 'বোসো দাদা—'

সুশোভন খাটের এক কোণে বসলেন। অমরেশরা কিন্তু বসল না, দাঁড়িয়ে থাকল।

সমরেশ বলল, 'মেজ বৌদি নিজের হাতে পরিষ্কার করবার জন্যে তোমার ঘরটা রোজ একবার করে খোলে। তা ছাড়া আর কাউকে আমরা এখানে ঢুকতে দিই না। দেখ, একটা জিনিসও নষ্ট হয় নি।'

এই ঘর, আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে কিছুই ভাবছিলেন না সুশোভন। সেই আগের প্রশ্নটাই তিনি আরেক বার করলেন, 'এবার বল, আমাকে কেন এভাবে এখানে নিয়ে এলি?'

গোটা ঘরটায় হঠাৎ অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এল। অমরেশ সমরেশ আর দিবাকর—তিনজনকেই খুব বিচলিত দেখাচ্ছে। কেউ একটা কথাও বলল না, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুশোভন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যেন, 'কী হল, চুপ করে আছিস কেন? যা বলার স্পষ্ট করে বল—আমি কিচ্ছু মনে করব না।'

অমরেশ সমরেশ মুখ তুলল না। তবে দিবাকর এবার সোজা

সুশোভনের দিকে তাকাল। দু-তিনবার চেষ্টার পর বলল, 'আজ ঝুমুরের বিয়ে। তাই—'

'ঝুমুর !'

'মেজদার মেয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে জাপানী পুতুলের মতো ফুটফুটে একটি মেয়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল সুশোভনের। আট বছর আগে অমরেশ মানে অমুর এই মেয়েটা সুশোভন যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন সব সময় তাঁর সঙ্গে আঠার মতো জুড়ে থাকত। তিনি যখন 'শেভ' করতেন ঝুমুর তাঁর পিঠে হেলান দিয়ে বসত। সুশোভন হয়ত খবরের কাগজ পড়ছেন কিংবা কারো সঙ্গে গল্প-টল্প করছেন, ঝুমুর তাঁর কোলটাকে সোফা বানিয়ে নিত। তাঁর সঙ্গে বসে না খেলে ঝুমুরের খাওয়া হত না ; রাত্তিরে তাঁর কাছে শোয়াটি না হলে মেয়েটার ঘুমই আসত না। আশ্চর্য, সেই ঝুমুরের আজ বিয়ে অথচ একটু আগেও তিনি তা জানতেন না। বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো একটা দুঃখ তিনি স্তম্ভিত অনুভব করলেন। পরক্ষণেই দারুণ এক বিস্ময় দুঃখটাকে মুছে দিয়ে সব কিছু তাঁকে যেন পুরোপুরি দখল করে নিল। অবাক হয়ে সুশোভন বললেন, বিদ্যুৎ-চমঝুমুর এত বড় হয়ে গেছে !'

সমরেশ দিবাকর বলল, 'হবে না ! তুমি তো অনেক দিন ওকে দেখ নি।'

গে 'কোথায় বিয়ে হচ্ছে রে ?'

'যোধপুর পার্কে। নাম-করা ফ্যামিলি। ঝুমুরের শ্বশুর দিল্লীতে ফিনান্স মিনিস্ট্রির খুব বড় অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করবার পর কলকাতায় এসে যোধপুর পার্কে বাড়ি করেছেন। দুটি মাত্র ছেলে, দুজনেই ব্রিলিয়াণ্ট।'

'যে ছেলেটির সঙ্গে ঝুমুরের বিয়ে হচ্ছে সে কী করে ?'

'ফরেন সার্ভিসে আছে ; আই-এফ-এস। এখন কানাডায় পোস্টেড। এক মাসের ছুটিতে এসেছিল, খোঁজখবর পেয়ে আমরা ছেলের বাবাকে গিয়ে ধরাধরি করলাম। উনি রাজী হলেন। ঝুমুরের লাকটা ভালো।'

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ের পর ঝুমুর কি কানাডায় চলে যাবে ?'

সমরেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, 'বা রে, যাবে না! ওরা তো বলেছে বিয়ের পরই পাসপোর্ট-টাসপোর্টের ব্যবস্থা করে ফেলবে। ফরেন সারভিসে আছে, কোন অসুবিধা হবে না।'

দারুণ ভালো লাগছিল সুশোভনের। বললেন, 'আমার লাকটাও ভালো। এমন একটা আনন্দের দিনে এসে পড়েছি। চল, মেয়েটাকে দেখে আসি।' সুশোভন উঠে পড়লেন।

আবহাওয়াটা আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এসেছিল। আচমকা আবার গোটা ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

সুশোভন তাড়া লাগালেন, 'কী হল, চল—'

কারো নড়াচড়ার লক্ষণ নেই ; অমরেশরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। সমরেশ শুধু দু-বার ঢোঁক গিলে বলল, 'কিন্তু দাদা—'

'কী ?'

'তুমি না গেলেই ভালো হয়।'

'তার মানে !'

'তুমি এসেছ, এটা জানাজানি হলে—'

রুদ্ধশ্বাসে সুশোভন বললেন, 'জানাজানি হলে কী ?'

সমরেশ বলল, 'একটা আনপ্লেজাণ্ট ব্যাপার-ট্যাপার ঘটে যেতে পারে।'

'কী বলতে চাইছিস তুই ?'

সমরেশ ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ; উত্তর দিল না।

সুশোভন আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ডান দিকের জানালার কাছ থেকে কোন মহিলার গলা ভেসে এল, 'ওঁদের বলতে অসুবিধা হচ্ছে ; আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

চমকে সুশোভন সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন অমিতা জানালার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গলার স্বরটা তারই।

অমিতার পেছনে মাধুরী আর সুধা। অমিতা দিবাকরের স্ত্রী। মাধুরী আর সুধা অমরেশ এবং সমরেশের। সুধা ছাড়া বাকি দুজন ভাইদের মতোই মোটা হয়েছে। কখন ওরা জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সুশোভন টের পাননি।

তিনি জেলে যাবার আগেই তিন ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। ভাইদের স্ত্রীদের স্বভাব ব্যবহার কি রকম সে সম্পর্কে সুশোভনের স্পষ্ট ধারণা আছে। অবশ্য এই ক'বছরে তারা যদি যথেষ্ট বদলে না গিয়ে থাকে।

দিবাকরের স্ত্রী অমিতা খুবই নাক-উঁচু মেয়ে; মানুষকে সে দশ হাজার ফুট ওপর থেকে দেখে থাকে। কারণ তার বাবা একজন এক্স ডেপুটি মিনিস্টার। প্রাক্তন এই উপমন্ত্রীটি কিন্তু মানুষ হিসেবে বেশ ভালো—অত্যন্ত সজ্জন এবং মিষ্টভাষী। পনের কুড়ি বছর আগে দেড় বছরের জন্য তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব করেছেন তিনি কিন্তু ঝাঁঝটা বেড়েছে মেয়ের; বাপের মন্ত্রিত্ব যাবার পরও সেটা থেকেই গেছে। অন্ততঃ জেলে যাবার আগে তাই দেখে গেছেন সুশোভন। অমরেশের স্ত্রী মাধুরী পয়সাওলা বনেদি ঘরের মেয়ে। তার মধ্যে দারুণ অহংকার আছে; তবে তার প্রকাশ নেই। অহংকার বা দম্ভকে সে ভদ্রতার তবক দিয়ে মুড়ে রাখতে জানে। সমরেশের স্ত্রী সুধা কিন্তু একেবারে উল্টো। সে দুর্দান্ত সুন্দরী এবং সত্যিকারের গুণী মেয়ে। এক সময় ভালো রবীন্দ্র-সংগীত গাইত; ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছিল। তবে ওর বাবা ছিল দারুণ গরিব আর রুগ্ন; এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইতে সুশোভনের কাছে এসেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে সুশোভন সুধাকে দেখতে চেয়েছিলেন। দেখেশুনে এবং কথাবার্তা বলে তাকে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। সুশোভন শেষ পর্যন্ত অমরেশের সঙ্গে সুধার বিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ বিয়ের যাবতীয় খরচ তিনিই করেছিলেন। এ জন্য সুধা তাঁর কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ।

কয়েক পলক ভাইদের স্ত্রীদের দেখলেন সুশোভন। তারপর বললেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, তোমরা ভেতরে এসো—'

অমিতা সুধা মাধুরী, তিনজনই জানালার কাছ থেকে সরে এদিকের দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল।

সুশোভন বললেন, 'তোমরা ভালো আছো তো?'

মাধুরী সবার হয়ে আস্তে করে বলল, 'হ্যাঁ।'

সুশোভন লক্ষ্য করলেন, সুধা একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটি বিষাদে মাখানো। তাকে কিছু বললেন না সুশোভন। সোজা অমিতার দিকে ফিরলেন, 'তুমি কী যেন বলছিলে—আমাকে কী বুঝিয়ে দেবে?'

অমিতার গলা এমনিতেই মাধুর্যহীন, তীক্ষ্ণ। স্বরটা ঈষৎ চড়িয়ে সে বলল, 'বাজে সেন্টিমেন্টের আমি ধার ধারি না। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করেই বলছি। বরপক্ষ আপনাকে দেখলে, আপনার পরিচয় পেলে ঝুমুরের বিয়ে ভেঙে যেতে পারে।'

হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন সুশোভন, অঘ্রানের এই হিমজড়ানো ঠাণ্ডা রাত্তিরেও তিনি গলগল করে ঘামতে শুরু করলেন। ঘামে তাঁর জামাটামা ভিজে সপসপে হয়ে যেতে লাগল। মনে হল শরীরের সমস্ত হাড় আলগা হয়ে যাচ্ছে; তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। ক্লান্ত স্বরে সুশোভন বললেন, 'কেন?'

অমিতা বলল, 'আপনি নিজেই তা জানেন।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

একটু আগেও দিবাকর সুশোভনের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারছিল না। স্ত্রীকে কাছে পেয়ে সে যেন মেরুদণ্ডে অনেকখানি জোর পেয়েছে এবং বেশ কিছুটা নৈতিক সমর্থনও। দিবাকর এবার বলল, 'মার্ডার চার্জে তুমি জেল খেটে এসেছো। যে ফ্যামিলিতে খুনের আসামী রয়েছে সেখানে কেউ কি ছেলের বিয়ে দিতে চায়?' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার জন্যে ঝুমুরের বিয়েটা ভেঙে যাচ্ছিল। ছেলের বাবা তোমার কথা জানতে পেরে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হয়েছে, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

সমরেশ বলল, 'বুঝতেই পারছ দাদা, এ রকম ছেলে রাস্তায়-ঘাটে পাওয়া যায় না।'

সুশোভনের মাথা টলছিল। তিনি পড়েই যেতেন ; হাত বাড়িয়ে খাটের একটা বাজু ধরে অনিবার্য পতন আটকালেন। তারপর অবরুদ্ধ গোঙানির মতো শব্দ করে বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস কর আমি তোদের বৌদিকে খুন করিনি, খুন করিনি—'

'কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজের মুখেই তুমি খুনের কথা স্বীকার করেছ।'

'হ্যাঁ করেছি। সেদিন না করে উপায় ছিল না। আজ তোদের কাছে সব কনফেস করছি। কনফেসানটা শুনে তোরাই ভেবে ছাখ আমার অন্যায় কতটা—'

দিবাকর বলল, 'এখন আর এসব শুনে কী হবে। যা ড্যামেজ হবার তা তো হয়েই গেছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন সুশোভন, 'তা ঠিক। সত্যিই তো, জেল খেটে আসার পর দাগী আসামীর কনফেসানের কোন মানে হয় না। তোরা শুধু আমাকে একটা কথা বলে দে—'

'কী ?'

'আমি এখন কী করব ?'

কেউ উত্তর দিল না।

অত্যন্ত অসুস্থভাবে খাটের একধারে বসতে বসতে ক্লান্ত গলায় সুশোভন বললেন, 'মনে হচ্ছে হঠাৎ এসে পড়ে তোদের বিপদে ফেলে দিয়েছি। আমি থাকলে নিশ্চয়ই তোদের আরো অনেক রকম অসুবিধা হবে।'

অমরেশ এবার বলল, 'দেখ দাদা, তুমি আমাদের বাবার মতো মানুষ করেছ। কিন্তু—'

মেজো ভাইয়ের দিকে ফিরে সুশোভন বললেন, 'কিন্তু কী ?'

অমরেশ চোখ নামিয়ে নিল, 'আমি বলতে পারব না।' দিবাকরকে লক্ষ্য করে বলল, 'দিবু, তুই বল—'

দিবাকর একটু ভেবে বলল, 'মেজদা ঠিকই বলেছে ; তুমি আমাদের অনেক স্যাক্রিফাইস করেছ। তোমার ঋণ আমরা সারা জীবনে শোধ করতে পারব না। তবে আমাদের দিকটা কনসিডার করে দেখ বড়দা, মোটামুটি আমাদের একটা স্ট্যাটাস হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে ; তাদের বিয়ে-টিয়ে দিতে হবে। তুমি এখানে থাকলে—মানে—'

শূন্য চোখে সুশোভন তাকিয়ে রইলেন।

দিবাকর বলতে লাগল, 'অবশ্য এ বাড়িতে থাকার লীগ্যাল রাইট তোমার আছে। কিন্তু সব দিক যদি ভাবো—'

করুণ হাসলেন সুশোভন, 'শুধু লীগ্যাল রাইটের জোরে আমাকে এ বাড়িতে থাকতে হবে, এটা কখনো ভাবি নি।'

দিবাকর কাচুমাচু মুখ করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বড়দা, তুমি ভুল বুঝো না। আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলতে চাই নি।'

'আমি কিচ্ছু ভুল বুঝি নি। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো। শোন, তোদের কোন অসুবিধাই আমি করব না। শুধু আজকের রাতটা তোরা আমাকে থাকতে দে। এই রাত্তিরে আর কোথায় ঘুরব। কথা দিচ্ছি, কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

এই সময় অস্পষ্ট শব্দ করে কেউ কেঁদে উঠল। চমকে ডান দিকে ফিরতেই সুশোভন দেখতে পেলেন সুধা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে। তার দু-চোখ জলে ভরে গেছে। সুশোভন টের পেলেন, এই মেয়েটা বদলায় নি : অবিকল আট বছর আগের মতোই আছে। সুধাকে দেখতে দেখতে তাঁর দু-চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর তিনি বললেন, 'কেঁদো না সুধা। আমি এখানে থাকলে সবার দুঃখ আর জটিলতাই শুধু বাড়বে।'

সুধা উত্তর দিল না।

সুশোভন ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা নিশ্চিন্ত থাক, যতক্ষণ আমি এ বাড়িতে আছি এই ঘর থেকে বেরুব না। শুধু একটা কথা রাখবি ?'

তিন ভাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী ?'

'ঝুমুরটার আজ বিয়ে। কোথায় কতদূর ও চলে যাবে, ওরা এখানে থাকব না। জীবনে আর হয়ত দেখাই হবে না। যদি অসুবিধা না হয় ওকে একবার এখানে নিয়ে আয় না—'

ভাইরা বিব্রত হয়ে পড়ল। বিপন্ন মুখে সমরেশ বলল, 'কিন্তু দাদা যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়—'

এই সময় সুধা কান্নাভাঙা মৃদু গলায় বলে উঠল, 'যা হবার হবে। আমি ঝুমুরকে নিয়ে আসছি। আজকের দিনে আপনার আশীর্বাদ ওর দরকার।' সুধা একরকম ছুটতে ছুটতেই বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন দিবাকর আর অমিতাও। খুব সম্ভব কেউ জেনে না ফেলে সেজন্য ওরা ঝুমুরকে সাবধানে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবে।

ঘরের ভেতর এখন অদ্ভুত নীরবতা। হঠাৎ বুবুনের মুখ মনে পড়ে গেল সুশোভনের। আশ্চর্য, এ-বাড়িতে পা দিয়ে প্রথমেই তার খোঁজ নেবার কথা ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর এমন সব ঘটনা ঘটেছে যাতে বুবুনের কথাটাই খেয়াল হয় নি। এবার অমরেশের উদ্দেশে সুশোভন বললেন, 'অমু, বুবুনকে একটা খবর দে। কাল সকালে আমি চলে যাব। যাবার আগে একবার ওকে দেখে যাই। কতদিন ছেলেটাকে দেখি না।'

অমরেশ বলল, 'বুবুন তো এখানে থাকে না।'

সুশোভন অবাক হয়ে গেলেন, 'কোথায় থাকে তা হলে ?'

'ওর মামার বাড়িতে।'

'কবে গেছে ওখানে ?'

'তোমার কনভিকসান হবার পর বুবুনের মামারা এসে ওকে নিয়ে গিয়েছিল ; আর ফিরে আসে নি।' বলে একটু থামল অমরেশ। কি ভেবে নিয়ে পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আমরা কয়েক বার ওকে আনতে গেছি ; বুবুনের মামারা আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

আধফোটা গলায় সুশোভন শুধু বললেন, 'ও।'

এই সময় ঝুমুরকে নিয়ে সুধারা ফিরে এল। না জানা থাকলে তাকে চিনতে পারতেন না সুশোভন।

ঝুমুর এখন পরিপূর্ণ তরুণী। পানপাতার মতো মুখ তার, সরু খাঁজকাটা চিবুক, গায়ের রঙ আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। চোখদুটো ঘন পালকে ঘেরা এবং দীর্ঘ, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের।

ঝুমুরের পরনে এখন আগুন-রঙ বেনারসী, কপালে চন্দনের কারুকাজ, গা-ভর্তি নতুন জড়োয়া গয়না, চোখে কাজলের দীর্ঘ টান। কনের সাজে তাকে রানীর মতো দেখাচ্ছে। অত্যন্ত নম্র সে ; বিয়ের দিন বলে আশ্চর্য এক লজ্জা লাবণ্যের মতো তাকে ঘিরে আছে।

ঘরে এসে আরক্ত নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। মনে হচ্ছে তার হাত-পা এবং নতুন বধূবেশ থেকে স্নিগ্ধ এক আভা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আট ন'বছর আগে যে আদুরে এবং জেদী মেয়েটা সুশোভনের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত তার সঙ্গে এই শান্ত ধীর লাজুক তরুণীর কোন মিল নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঝুমুরকে দেখছিলেন সুশোভন ; তাঁর চোখে পলক পড়ছিল না।

পাশ থেকে সুধা মৃদু গলায় ঝুমুরকে বলল, 'জেঠামশায়—প্রণাম কর।'

চমকে মুখ তুলল ঝুমুর। তার চোখে প্রথমে বিস্ময় আর কৌতূহল দেখা দিল। তার পরেই সে-সব ছাপিয়ে দারুণ ভয় ফুটে উঠতে লাগল। নিজের অজান্তেই দু'পা পিছিয়ে গেল ঝুমুর। সুশোভন যে একজন হত্যাকারী এবং অত্যন্ত ভীতিকর মানুষ, এ খবরটা নিশ্চয়ই তা আগে থেকে জেনেছে। সুশোভন জেলে যাবার পর তাঁর সম্পর্কে ভয়াবহ কোন 'মিথ' হয়ত এ-বাড়িতে ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে। পরের জেনারেসন সেই 'মিথ' শুনে শুনে তাঁর সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা গড়ে নিয়েছে।

ঝুমুরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে শ্বাসকষ্টের মতো অদ্ভুত এক কষ্ট অনুভব করলেন সুশোভন। তাঁর মুখের মুগ্ধ হাসিটা গভীর বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল।

সুধা মেয়েকে তাড়া লাগালেন, 'কি হল, পিছিয়ে এলি কেন? প্রণাম কর—'

দু-তিনবার বলার পর ঝুমুর কোনরকমে প্রণামটা সেরে মায়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। তারপর ভীতভাবে সুশোভনকে দেখতে লাগল।

আবছা ধরা গলায় সুশোভন শুধু বললেন, 'সুখী হও মা।' তারপর সুধার দিকে ফিরে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'সুধা, ঝুমুরকে নিয়ে যাও; এতক্ষণ ওকে না দেখে নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে।' ভাইদের বললেন, 'তোরাও যা। সবাই মিলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বিয়েবাড়ির কাজকর্ম চলবে কি করে? হ্যাঁ রে—'

অমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ?'

'বর এসে গেছে?'

'না।'

'আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছিস?'

'পাঠিয়েছি। সেই বিকেলবেলা চলে গেছে।'

'কে গেছে?'

'তারকদা আর ছোট মেসোমশাই।'

তারক সুশোভনদের পিসতুতো ভাই। সুশোভন বললেন, 'যোধপুর পার্ক আর কতদূর? ওদের আসার তো সময় হয়ে গেল। যা—যা—' বলে একটু থামলেন। তারপর কি ভেবে ভারী গলায় বললেন, 'তোরা চলে গেলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেব। নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, আমি যে এসেছি কেউ জানতে পারবে না।'

সবাই চলে গেল। ঘরের দরজা সত্যি-সত্যিই বন্ধ করে দিলেন সুশোভন। তারপর আলো নিভিয়ে সামনের বারান্দার দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁর এই ঘর বাদ দিলে গোটা বাড়িটা তেমনি আলোর ফোয়ারার

মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুন্দর সুন্দর মেয়েরা রঙীন প্রজাপতি হয়ে তেমনি উড়ছিল। সারা বাড়ি জুড়ে শুধু হৈ-চৈ, ছোটাছুটি, ব্যস্ততা। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে ফিনকি দিয়ে হাসির শব্দ উঠে আসছে। কোমল নিখাদে আগের মতোই সানাই বেজে যাচ্ছিল।

এরই মধ্যে একসময় ফুল দিয়ে সাজানো বরের গাড়ি এসে গেল। বিয়েবাড়ির সবাই হুড়মুড় করে ছুটে গেল গেটটার কাছে। সানাইয়ের সুরের সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল, ঝাঁক ঝাঁক উলুর শব্দ শোনা যেতে লাগল। আর তার ভেতর সুধা বরকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে এল।

চমৎকার দেখতে ছেলেটি ; বয়সও খুব কম! ঝুমুরের সঙ্গে দারুণ মানাবে।

চারদিকে এত আনন্দ, এত মানুষজন, এত অজস্র উচ্ছ্বাস কিন্তু সেখানে সুশোভনের যাবার উপায় নেই। এক অন্ধকার নির্জন দ্বীপে তাঁকে নির্বাসন দিয়ে সবাই এখন উৎসবে মেতে উঠেছে।

কতক্ষণ জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সুশোভনের মনে নেই। হঠাৎ দরজায় আস্তে টোকা পড়ল। চমকে সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

বাইরে থেকে মৃদু গলায় সুধা বলল, 'আমি।'

সুশোভন কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার সুধা?'

'দরজাটা একটু খুলুন দাদা—'

আলো জ্বেলে সুশোভন দরজা খুলে দিলেন। সুধা ভেতরে ঢুকল। তার এক হাতে ধবধবে তোয়ালে ঢাকা প্রকাণ্ড একটা থালা, আরেক হাতে জলের গেলাস।

খাটের কাছেই কারুকাজ-করা ছোট একটা কাশ্মীরী টেবল ছিল। থালা-গেলাস তার ওপর নামিয়ে রেখে সুধা বেরিয়ে গেল। দু'মিনিট পর আবার যখন সে ফিরে এল, তার হাতে বড় একটা টার্কিশ তোয়ালে আর সোপকেস। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিয়ে সুধা বলল, 'হাত-মুখ ধুয়ে নিন দাদা—'

সুশোভনের আরেক বার মনে হল, সবাই বদলে গেলেও এই মেয়েটা এতটুকু বদলায় নি। তাঁর সম্বন্ধে সুধার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতাবোধ—সব কিছু আগের মতোই অটুট রয়েছে। সুশোভনের চোখের শিরা সিরসির করতে লাগল। মনে হল সেখানে জল এসে যাবে। সুশোভন ঝাপসা গলায় বললেন, 'বিয়েবাড়িতে এত কাজকর্ম; সে সব ফেলে তুমি আমার খাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন সুধা?'

সুধা বলল, 'এটাও আমার কাছে একটা বড় কাজ।'

'বিয়ে হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ। বর-কনে এই মাত্র বাসর ঘরে গেল।'

'বরযাত্রীদের খাওয়া হয়েছে ?'

'এখনও শেষ হয় নি—খাচ্ছে। ওদিকটা নিয়ে ভাববেন না দাদা, সব ব্যবস্থা হবার পর আপনার কাছে এসেছি। আর দেরি করবেন না ; অনেক রাত হয়ে গেছে।'

সুশোভন আর কিছু বললেন না। সুধার হাত থেকে তোয়ালে আর সাবান নিয়ে পাশের বাথরুমটায় চলে গেলেন। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরেই অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছে।

মিনিট পাঁচেক বাদে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে সুশোভন দেখলেন, কোত্থেকে একটা আসন যোগাড় করে মেঝেতে পেতে খাবার-টাবার পরিপাটি করে সাজিয়ে বসে আছে সুধা।

সুশোভন বললেন, 'আমি খেয়ে নেব। তুমি ওদিকে যাও সুধা।'

'আপনার খাওয়া না হলে আমি যাব না।'

'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। বিয়েবাড়িতে কত রকম দরকার আছে। এতক্ষণে হয়ত তোমার খোঁজ পড়ে গেছে।'

'অমিতা আর মাধুরীকে বলে এসেছি। কেউ খোঁজটোজ করলে ওরা সামলাবে। আপনি খেতে বসে যান দাদা।'

প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছে সুধা। ফ্রায়েড রাইস, ফিশ ফ্রাই, চিকেন, মাটন, লুচি, সন্দেশ, রাবড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি।

চুপচাপ খেতে লাগলেন সুশোভন ; সুধা কাছে বসে রইল।

চিরকালই মেয়েটা এই রকম। সুশোভনের বোন নেই। সেই ফাঁকা জায়গাটা সুধা এসে পূরণ করে দিয়েছে। সুশোভনের খাওয়া-দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তার বরাবরই তীক্ষ্ণ নজর। বিয়ের পর এ বাড়িতে পা দিয়েই এ ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল সুধা। সুশোভন না খেলে চিৎকার চেঁচামেচি বাধিয়ে তাকে খাওয়াত ; যতক্ষণ না খাওয়া হত কাছে বসে থাকত। সুশোভনের কিসে আরাম, কিসে আনন্দ—সব দু'দিনেই জেনে নিয়েছিল সুধা। আদুরে জেদী

বোনের মতো যখন-তখন সুশোভনের ওপর জোর খাটাত সুধা। সুশোভনের স্ত্রী পরমা তখনও বেঁচে। সে খুব খুশী হয়েই এই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। পরমা বলত, 'সুধা তুই এসেছিস, আমি বেঁচে গেছি ঐ ইনকাম-ট্যাক্সওলার যে কত ঝামেলা! আর পেরে উঠছিলাম না বাবা—'

সুধার এখন বয়স হয়েছে ; চেহারায় গাম্ভীর্যও এসেছে অনেকখানি। তা ছাড়া এতদিন বাদে যেভাবে তাঁদের দেখা তাতে কেউ আগের মতো স্বচ্ছন্দও হতে পারছিলেন না। তবু সুধার গাম্ভীর্য নম্রতা ইত্যাদির তলায় চিরদিনের যে জোরটা রয়েছে সেটা উপেক্ষা করতে পারেন নি সুশোভন। খাওয়ার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না সুশোভনের ; তবু তাঁকে খেতে বসতে হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আঁচিয়ে আসতেই এক গোছা চাবি সুশোভনের হাতে দিয়ে সুধা বলল, 'দাদা, আপনার আলমারির চাবি আপনার সব জিনিস আমি ভেতরে গুছিয়ে রেখেছি।' বলে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমি এখন যাই—'

সুশোভন বললেন, 'এসো—'

এঁটো থালা-টালা নিয়ে চলে গেল সুধা। সুশোভন আবার ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর সেই জানালাটার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ছাদের প্যাণ্ডেলে আর নীচের মেরাপের ভেতর এখন নিমন্ত্রিতরা খেতে বসে গেছে। ধবধবে উর্দিপরা ক্যাটারারের লোকেরা বড় বড় ট্রে-তে সুখাদ্যের স্তূপ সাজিয়ে টেবলে টেবলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর অন্যমনস্কের মতো সুশোভন জানালার কাছ থেকে খাটের দিকে চলে এলেন। হাতে সেই চাবির থোকাটা ছিল। ভেবে দু'পা এগিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন।

মাঝখানে ওয়ার্ড্রোব। ওপরে-নিচে অনেকগুলো তাক। ওয়ার্ড্রোবটা তাঁর ট্রাউজার, কোট, শার্ট আর পরমার দামী দামী শাড়ি এবং ব্লাউজে ঠাসা। তাকগুলোতে নানা রকম শৌখিন জিনিস

ফিলিগ্রির কাজ করা গয়নার বাক্স, আইভরি আর মোষের দাঁতের অগুনতি পুতুল, রুপোর তৈরি নকশা-কাটা হায়দ্রাবাদী কৌটো আর গাদা গাদা লেডীজ ব্যাগ। মেয়েদের ব্যাগ সম্বন্ধে দারুণ একটা দুর্বলতা ছিল পরমার। যেখানেই সে বেড়াতে যেত, সেখান থেকেই একটা করে ব্যাগ কিনে আনত।

একটা তাকে রয়েছে অসংখ্য গানের রেকর্ড। রেকর্ডগুলোতে পরমার গলা ধরে রাখা হয়েছে। এই সব গানের অনেকগুলোই সে সিনেমায় প্লে-ব্যাক করেছিল। বাকীগুলো এমনি রেকর্ড করে একটা নাম-করা রেকর্ড কোম্পানি বাজারে ছেড়েছিল। পরমা দারুণ ভালো গায়িকা ছিল। ক্লাসিকাল এবং আধুনিক—দুটোই সে চমৎকার গাইত। তার যে কোন রেকর্ড বাজারে বেরুতে না বেরুতে হুড়হুড় করে বিক্রি হয়ে যেত।

রেকর্ডগুলোর পাশেই রয়েছে অনেকগুলো সুন্দর ট্রফি আর এমব্লেম। নানা প্রতিষ্ঠান এগুলো পুরস্কার হিসেবে পরমাকে দিয়েছিল। মনে আছে দু'বার শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক গায়িকার সম্মান পেয়েছিল পরমা।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রেকর্ড আর পুরস্কারগুলো দেখলেন সুশোভন। তারপর মুখ তুলতেই ওপর দিকের তাকে একটা চেক-বই চোখে পড়ল; তার পাশে ব্যাঙ্কের পাশ-বুকটাও আছে। এগুলোর কথা একেবারেই মনে ছিল না তাঁর। তাড়াতাড়ি চেক আর পাশ-বুকটা নামিয়ে পাতা উল্টে সুশোভন দেখলেন হাজার তিনেক টাকার মতো ব্যালান্স পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভেতরে ভেতরে খানিকটা আরাম বোধ করলেন। কালই তিনি এখান থেকে চলে যাবেন। কিছু টাকার তাঁর দরকার, খুবই দরকার। ভাইরা তাঁর সঙ্গে আজ যা ব্যবহার করেছে তাতে মরে গেলেও তিনি তাদের কাছে হাত পাততে পারবেন না। সুধা তাঁর সব জিনিসপত্র, বিশেষ করে এই চেক-বই পাশ-বইগুলো সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে, সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

চেক-বইটই খাটে রাখলেন সুশোভন। পরক্ষণেই তাঁর খেয়াল হল শীত পড়তে শুরু করেছে; এখান থেকে চলে যাবার আগে একটা গরম জিনিস সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। ওয়ার্ড-রোব থেকে একটা কোট

বার করে আলমারিটা বন্ধ করতে যাবেন সেই সময় একেবারে ওপরের তাকে মোটা অ্যালবামটা চোখে পড়ল। কয়েক পলক থমকে দাঁড়িয়ে থাকলেন সুশোভন। তারপর কি ভেবে অ্যালবামটা নামিয়ে খাটের একধারে মোটা বাজুতে হেলান দিয়ে বসে দুরমনস্কের মতো পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

অ্যালবামটা অগুনতি ফটোগ্রাফের একজিবিসন যেন। বলা যায় এটা সুশোভনের পারিবারিক চিত্রশালা।

অ্যালবামে যে সব ছবি আছে তাদের কোন কোনটা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের তোলা। কোনটা তিরিশ বছর, কোনটা পঁচিশ বছর, কোনটা কুড়ি বছর—এইভাবে সময়েব হিসেব করে ফটোগুলো পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তবে অ্যালবামের শেষ ছবিটা দশ বছর আগের তোলা। অর্থাৎ সুশোভন জেলে যাবার পর নতুন ফটো আর এতে লাগানো হয় নি।

যে ছবিগুলো বেশি পুরনো সেগুলোর রং জ্বলে একেবারে কালচে হয়ে গেছে। তুলনায় যেগুলো কম পুরনো সেগুলোতে হলদে ছোপ ধরেছে।

প্রথম পাতাতেই রয়েছে তাঁদের এই বাড়ির ছবি, তারপর ঠাকুরদা ঠাকুরমার ছবি, তারপর বাবা এবং মায়ের। ক্রমশঃ সুশোভন, অমরেশ, সমরেশ, দিবাকর এবং তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের। অর্থাৎ এই পরিবারের চার জেনারেসনে যত মানুষ রয়েছে তাদের ছবির ধারাবাহিক প্রদর্শনী এই অ্যালবামে ধরে রাখা হয়েছে।

এলোমেলোভাবে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলেন সুশোভন। এই পাতাটায় তাঁর আর পরমার বিয়ের অনেকগুলো ছবি আটকানো রয়েছে। কোনটায় মালাবদলের, কোনটায় শুভদৃষ্টির, কোনটায় বাসর ঘরে পাশাপাশি বসে থাকার দৃশ্য। তাঁদের ঘিরে হাস্যোজ্জ্বল বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের ভিড়।

বাইরে ঢিমে তালে কোমল নিখাদে সানাই বেজে যাচ্ছিল; প্যাণ্ডেল-ট্যাণ্ডেল থেকে নিমন্ত্রিতদের টুকরো টুকরো হাসির শব্দ এবং হৈ-চৈ ভেসে আসছে।

ধীরে ধীরে নিজের বিয়ের স্মৃতিজড়ানো ছবিগুলো, বাইরে সানাই-বাজির সুর এবং ঝুমুরের বিয়েতে যারা এসেছে তাদের কথাবার্তা আর হাসাহাসির শব্দ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। সুশোভন আশ্চর্য এক উজান টানে দ্রুত পেছন দিকে ফিরে যেতে লাগলেন। না, পরমা নয়, প্রথমে যাঁর কথা মনে পড়ছে তিনি ঠাকুরদা।

ঠাকুরদার আগে পর্যন্ত সুশোভনদের যে পারিবারিক ইতিহাস পাওয়া যায় তা খুবই ম্যাড়মেড়ে ; চমক দেবার মতো তাতে কিছুই নেই। তাঁদের ফ্যামিলি ছিল অন্য দশটা লোয়ার মিডল-ক্লাস পরিবারের মতো।

কিন্তু ঠাকুরদা ম্যাজিসিয়ানের মতো রাতারাতি তাঁদের পারিবারিক প্যাটার্নটাকে একেবারে পালটে দিয়েছিলেন। এক টানে সেটাকে নিচু একটা লেভেল থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন অনেক—অনেক ওপরে।

তখন ইংরেজ রাজত্ব। ঠাকুরদা ছিলেন দারুণ বুদ্ধিমান আর উদ্যোগী মানুষ। তা ছাড়া অত্যন্ত সুপুরুষও। কেমন করে যেন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একজন আণ্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব করে ফেলেছিলেন। আর এই যোগাযোগটাকে তিনি ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা কাজে লাগিয়েছিলেন।

ঠাকুরদার নিজের ক্যাপিটাল ছিল না। তাই পয়সা-ওলা এক বন্ধু জুটিয়ে পার্টনারশিপে স্টিভেডোরি ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

সেই আণ্ডার সেক্রেটারি তো ছিলেনই। তাঁকে আঁকশির মতো ব্যবহার করে উঁচু ডালের আরো বড় বড় ইংরেজ অফিসার, এমন কি লাটসাহেবকে পর্যন্ত ঠাকুরদা ধরে ফেলেছিলেন।

সুশোভনের আবছা আবছা মনে পড়ে তাঁর খুব ছেলেবেলায় নিউ ইয়ার্স ডে এবং বড় দিন এলেই বাড়িতে উৎসবের ধুম পড়ে যেত। ঠাকুরদা নিজে নিউ মার্কেট থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেটকি রুই আর গলদা চিংড়ি, পার্ক স্ট্রীট থেকে দশ পাউণ্ড ওজনের বিরাট বিরাট ...ট্রি

একেকটা কেক, সাহেবপাড়ার ট্যাভার্ন থেকে পেটি পেটি হুইস্কি বোতল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো থেকে নানা রকম উপহারের জিনিস কিনে আনতেন। সুদৃশ্য ঝুড়িতে ঝুড়িতে সেগুলো সাজিয়ে, ঝুড়িগুলোর গায়ে আইভরি ফিনিশ কার্ডে 'এক্স মাস' কি 'নিউ ইয়ার্স ডে' গ্রিটিংস লিখে সিল্কের ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত।

এই উদ্দেশ্যে খান পাঁচ-ছয়েক গাড়ি যোগাড় করতেন ঠাকুরদা। ঝুড়িগুলো সেই সব গাড়িতে তুলিয়ে র‍্যাঙ্কেনের বাড়ির দামী স্যুট আর চকচকে স্যু পরে তিনি একটা গাড়িতে উঠতেন। অন্য গাড়িগুলোতে উঠত ধবধবে উর্দি-পরা দশ বারোটা স্মার্ট বেয়ারা। তারপর সাহেব পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেয়ারাদের মাথায় একেকটা ঝুড়ি তুলে ঠাকুরদা নিজে ভেট দিয়ে আসতেন। এ সবের নীট ফল দাঁড়িয়েছিল এই, চড় চড় করে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। কয়েক বছরের মধ্যে বরানগরে গথিক স্ট্রাকচারের এই বাড়িটি করিয়েছিলেন তিনি; খানকয়েক ফোর্ড গাড়ি কিনেছিলেন। এ ছাড়া অ্যাসেট আর তিনি বাড়ান নি; টাকাও সেভাবে জমান নি। লাভের যে অংশ তাঁর হাতে এসেছে সেটা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারটেয়ার কিনে ইনভেস্ট করতেন।

স্বাধীনতার ঠিক পর পরই ঠাকুরদা মারা গেলেন; তার কয়েক বছর আগে ঠাকুমারও মৃত্যু হয়েছে। ঠাকুরদার চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁর অত বড় জাহাজী কারবারটা সুশোভনদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বাবা।

বাবা ছিলেন ঠাকুরদার একমাত্র ছেলে। কিন্তু ঠাকুরদার চরিত্রের এক কানাকড়িও তিনি পান নি। ঠাকুরদার উদ্যোগ, পরিশ্রমের ক্ষমতা, চাতুর্য বা কৌশল—কোনটাই ছিল না তাঁর। দুর্দান্ত ছাত্র ছিলেন বাবা। তাঁর সাবজেক্ট ফিলজফি। এই বিষয়ে তিনি দুটো ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট। ঠাকুরদা অনেক জোরজার এবং রাগারাগি করা সত্ত্বেও বাবাকে তাঁর ব্যবসাতে বসাতে পারেন নি। বাবা গিয়েছিলেন কলেজে অধ্যাপনা করতে। ছাত্র আর পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন

ব্যবা। সেই সঙ্গে ছিলেন দারুণ আমুদে। নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অবিকল বন্ধুর মতো।

ফিলজফির মতো একটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকলেও তিনি ছিলেন সব দিক থেকে ঝকঝকে আধুনিক মানুষ। কোন রকম বাজে সংস্কার বা গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। তবে বিনয়, মমত্ববোধ, বিশেষ করে সততা এবং ন্যায়নীতি—এ জাতীয় ভ্যালুজ সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

সব ব্যাপারেই বাবার কৌতূহল ছিল টগবগে। একজন নিখুঁত আধুনিক মানুষ হতে হলে যা-যা জানা দরকার সবই তিনি জানতেন; নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর জানাশোনা ছিল একেবারে আপ-টু-ডেট। যতদিন বেঁচে ছিলেন সর্বক্ষণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পা ফেলে চলেছেন। নিজে পিছিয়ে থেকে সময়কে এক ইঞ্চিও এগিয়ে যেতে দেন নি।

সাহিত্য, পলিটিক্স, স্পোর্টস—এসব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং মতামত ছিল খুবই স্পষ্ট আর উদার। ছেলেদের সঙ্গে এসব নিয়ে তো বটেই, এমন কি সেক্স নিয়েও খোলাখুলি আলোচনা করতেন। তাদের বলতেন, 'সেক্স ইজ এ ভাইটাল পার্ট অফ লাইফ। তোমরা বড় হতে যাচ্ছ; সেক্স সম্বন্ধে এখনই তোমাদের একটা পরিষ্কার আইডিয়া করে নেওয়া দরকার। তাতে ভবিষ্যতের অনেক প্রবলেম থেকে রক্ষা পাবে। তোমাদের লজ্জার কোন কারণ নেই।'

সব ব্যাপারে আগ্রহ থাকলেও একটা বিষয়ে বাবার দারুণ দুর্বলতা ছিল। সেটা হল ধ্রুপদী গান। এমন গানপাগলা মানুষ কচিৎ কখনো দেখা যায়। কলকাতায় যেখানে যত ধ্রুপদী গানের আসর বসত তার শ্রোতাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে যে মানুষটিকে দেখা যেত তিনি বাবা। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে শীতের মরসুমে কলকাতার পার্কে পার্কে প্যাণ্ডেল বেঁধে ক্লাসিকাল গানের কনফারেন্স বসানোর রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। বাবা ছিলেন প্রতিটি কনফারেন্সে দারুণ উৎসাহী পেট্রন। গানের আসরে এবং কনফারেন্সে রাতের পর রাত জেগে

কাটিয়ে দিতেন। এই রকম এক কনফারেন্সে পরমাকে প্রথম দেখেছিলেন বাবা। কিন্তু সে কথা পরে।

ঠাকুরদার মৃত্যুর পর স্টিভেডোরি কারবারটা হাতছাড়া হয়ে গেলেও বাবার কিন্তু এতটুকু আপসোস হয় নি। কোর্টে গেলে অনায়াসেই তিনি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে নিতে পারতেন; বাবা যান নি। এমন কি ঠাকুরদা বিভিন্ন কোম্পানির যে সব শেয়ার কিনেছিলেন, সেগুলোরও খোঁজখবর করেন নি। গাড়িটাড়ি তাঁর ভালো লাগত না। ট্রামে-বাসে চড়তে কিংবা পায়ে হেঁটে জনস্রোতে ভেসে বেড়াতে দারুণ পছন্দ করতেন। বলতেন, 'গাড়িতে করেই যদি ঘুরি ওয়ার্ল্ড থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যাব। পীপলের সঙ্গে না মিশলে দেশকে জানব কি করে, মানুষকে বুঝব কি ভাবে?' ঠাকুরদা যে ফোর্ড গাড়িগুলো কিনেছিলেন এক এক করে সব বেচে দিয়েছেন বাবা। থাকার মধ্যে ঠাকুরদাব আমলের এই বাড়িটাই শুধু আছে। পৈতৃক ঐশ্বর্য থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের পড়াশোনা, অধ্যাপনা, স্পোর্টস, পলিটিকস, লিটারেচার এবং ধ্রুপদী গান সম্বন্ধে অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বাবা এই পৃথিবীতে বেঁচে গেছেন।

স্বভাবের দিক থেকে মা ছিলেন বাবার একেবারে উল্টো। দেখতে ছিলেন প্রতিমার মতো। টাটকা রোদের মতো গায়ের রঙ, বড় বড় টানা টানা চোখ, কোঁচকানো কোঁচকানো চুল কোমর ছাপিয়ে নেমে যেত। মা দুধের মতো ধবধবে জমির নকশাপাড় তাঁতের শাড়ি পরতে ভালবাসতেন; তাঁর পিঠের দিকের আঁচলে বাঁধা থাকত চাবির গোছা।

মা ছিলেন খুবই চুপচাপ, শান্ত আর ধীর। কথা বলতেন কম, হৈ-চৈ করতে পারতেন না। স্বামী, সংসার আর ছেলেরা—এর বাইরে যে প্রকাণ্ড একটা পৃথিবী আছে সে সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট, কৌতূহল আরও কম। দারুণ অনুভূতিপ্রবণ মানুষ মা; স্নেহ তাঁর চোখে আলগা লাবণ্যের মতো মাখানো থাকত। তীব্র দুঃখ বা প্রবল আনন্দ, কোন কিছুই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ করতে পারতেন না; শুধু চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকত।

মা-বাবা ছাড়া সুশোভনরা ছিলেন চার ভাই। বাবা আর মায়ে মিলিত চরিত্র, রুচি এবং মানসিকতার আবহাওয়ায় চার ভাই একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছিল।

প্রথম দিকে মোটামুটি এই ছিল তাঁদের পরিবারের রেখাচিত্র।

সুশোভনের মনে পড়ছে, ঠাকুরদার আমলে যখন প্রচুর পয়সা আসছে, তাঁদের পরিবারটা দারুণ স্পীডে প্রায় হাউইয়ের মতো আকাশের দিকে ছুটছিল। তখন তাঁর বয়স কম। তবু স্পষ্ট মনে আছে —সে সময় প্রতি মাসেই তাঁদের এই বরানগরের বাড়িতে ছাদে মেরাপ বেঁধে পার্টি দেওয়া হত। সাহেবসুবোরা আসতেন, মধ্য রাত পর্যন্ত হুইস্কির ফোয়ারা বয়ে যেত। এ বাড়ির পুরুষেরা র‍্যাঙ্কেনের বাড়ির স্যুট ছাড়া পরত না। মেয়েদের জন্য গয়না আসত সাহেবপাড়ার জুয়েলারদের দোকান থেকে, পারফিউম আসত হোয়াইটওয়ে লেডলোর ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর থেকে আর শাড়ি আসত বেনারস কি মাইশোর থেকে।

বাবা সেই স্পীডটাকে কমিয়ে সংসারটাকে তাঁর পছন্দ এবং রুচির মাপে একটা মধ্যবিত্তসুলভ ভদ্র চেহারা দিয়েছিলেন। মোটামুটি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সব কিছু চলছিল। এইভাবে চলতে চলতে আচমকা ব্রেক কষার মতো সংসারটা থমকে গেল যেন। একদিন বাবার কলেজ থেকে ফোন এল, তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খবর পাওয়ামাত্র সুশোভনরা দৌড়লেন। হাসপাতাল থেকে জানা গেল, অত্যন্ত সীরিয়াস ধরনের করোনারি অ্যাটাক হয়েছে বাবার। এখন বেশী কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

দু মাস পর বাবা যখন বেরিয়ে এলেন ডাক্তাররা তাঁর সামনে এবং পেছনে স্পষ্ট রেখায় অনেকগুলো গণ্ডি কেটে দিয়েছেন। সেগুলো পেরুনো তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ! এখন থেকে পড়াশোনা কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে, বেশি কথা বলা চলবে না, টেনসান এবং এক্সাইটমেণ্ট থেকে এক হাজার মাইল তফাতে থাকতে হবে। তাঁর পক্ষে সব সময়

কশ মেজাজে আনন্দের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কেননা প্রথম আক্রমণেই হার্ট যেভাবে ড্যামেজ হয়েছে, এরপর দ্বিতীয় অ্যাটাক হলে কি হবে বলা মুশকিল। লাইফের গ্যারান্টি তাঁরা দিতে পারবেন না। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া এবং চলাফেরার ব্যাপারেও অনেক রকম বাধা নিষেধ তাঁরা ছকে দিয়েছেন।

প্রেসক্রপসান হাতে নিয়ে সীনিয়র হার্ট স্পেশালিস্টের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসেছিলেন বাবা। বলেছিলেন, 'আপনারা আমাকে একটা ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন দেখছি।'

হার্ট স্পেশালিস্ট বলেছিলেন, 'কি করব বলুন, আপনাকে বাঁচাতে হবে তো।'

'এভাবে বেঁচে থাকা মানিংলেস। তবু আপনাদের কথামতো চলতে চেষ্টা করব।'

হাসপাতাল থেকে সুশোভনরা চার ভাই এবং মা বাবাকে আনতে গিয়েছিলেন। ট্যাক্সিতে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাবা সুশোভনদের বলেছিলেন, 'নাউ আই অ্যাম অলমোস্ট এ ডেড ম্যান। নিজের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছি।'

আমুদে হাসিখুশী তাজা টগবগে বাবাকে জীবনে এই প্রথমে ভেঙে পড়তে দেখেছিলেন সুশোভন। চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত এক পলক মাকে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। মায়ের ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপছিল আর দু-চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল। তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুশোভন বাবাকে বলেছিলেন, 'বাবা, তুমি তো এরকম পেসিমিস্টের মতো কথা কখনও বল না।'

'বাট ইটস এ নেকেড ট্রুথ পাবু—একেবারে উলঙ্গ সত্য।' সুশোভনের ডাকনাম পাবু।

'বাবা, তুমি আবার আগের মতো হও। তেমনি লাইভলি, ব্রাইট—'

বাবা জোরে জোরে মাথা নেড়েছিলেন, 'আর তা সম্ভব নয়। আই অ্যাম ফিনিশড ; আমি শেষ হয়ে গেছি।'

অবরুদ্ধ গলায় সুশোভন শুধু বলেছিলেন, 'বাবা, প্লীজ—' আগেই বলা হয়েছে ছেলেদের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন। অগুনতি বাস-ট্রাম-ট্রাক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইঁদুরের মতো পথ কেটে কেটে তাঁদের ট্যাক্সিটা বাড়ির দিকে ছুটছিল। একসময় হঠাৎ বাবা আবার বলতে শুরু করেছিলেন, 'একটা কথা ভাবছি পাবু—'

'কী?'

'আমার তো কোনরকম সেভিংস নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে দশ বারো হাজার টাকার মতো পড়ে আছে। তার ওপর পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেলাম। এখন সংসার চলবে কি করে? তোরা তো এখনও কেউ দাঁড়াস নি।'

সেই সময় সুশোভনের বয়স বাইশ-তেইশ; ইকনমিক্স নিয়ে এম-এ পড়ছেন; সেটা ছিল ফিফথ ইয়ার। পরের ভাই অমরেশের মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়াব চলছে। তার পরের ভাই সমরেশ সবে শিবপুরে বি-ই কলেজে ঢুকেছে আর ছোট ভাই দিবাকর স্কুল ফাইন্যাল দেবে।

সুশোভন বলেছিলেন, 'ডাক্তাররা তোমাকে বেশি ভাবতে বারণ করেছেন বাবা। নো টেনসান, নো এক্সাইটমেণ্ট—'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নয়।'

'আমার কথাটা শোন পাবু—'

'তোমার কোন কথা আমি শুনব না। বাড়ির সম্বন্ধে যা ভাবার এবার থেকে আমি ভাবব।'

'তুই যে একেবারে ছেলেমানুষ। এতগুলো লোককে কি করে সেভ করবি?'

'আমি আর পড়ব না।'

'পড়বি না! এত ভালো কেরিয়ার তোর; সেটা নষ্ট করে দিবি?'

বাবার মতোই সুশোভন ছিলেন দুর্দান্ত ভালো ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেসন এবং ইণ্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। বি-এতে ফার্স্ট ক্লাস

অনার্স। তিনি বলেছিলেন, 'সবে ফিফথ ইয়ার শুরু হয়েছে। এম-এ পরীক্ষা দিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে আমার বেরুতে বেরুতে তু-বছরের মতো লেগে যাবে। ততদিন—'

সুশোভনের ইঙ্গিতটা খুবই পরিষ্কার। অর্থাৎ এম-এ ডিগ্রি পেতে হলে যে তুটো বছর লাগবে ততদিন সংসার কিভাবে চলবে? বাবা উত্তর দেন নি; তাঁর বুকের গভীর তলদেশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল শুধু।

সুশোভন এবার বলেছিলেন, 'এম-এ ডিগ্রি সম্বন্ধে আমার কোন-রকম ইলিউসন নেই। ওটা পেলে এক্সট্রা ওয়েট হয়ত একটু বাড়ে। না পেলে লাইফ নষ্ট হয়ে যায় বলে আমি মনে করি না। বাবা, আমি ঠিক করে ফেলেছি, চাকরি করব।'

'ভেবেছিলাম এম-এ-টা হয়ে গেলে তুই রীসার্চ করবি।' বলে আঙুল দিয়ে নিজের কপালটা দেখিয়েছিলেন বাবা, 'সবই লাক—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'টেক ইট ইজি বাবা। তুমি তো জানো লাইফটা একটা লং ডিসট্যান্স মোটর রেস। তুমি অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়েছ। আমি তোমার এলডেস্ট সান; তোমার পরেই এ বাড়িতে আমার প্লেস। ডাক্তাররা তোমাকে কমপ্লীট রেস্ট নিতে বলেছেন। এবার স্টীয়ারিংটা আমার হাতে দাও।'

বাবা আর কিছু বলেন নি। বিষণ্ণ চোখে উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন।

সুশোভন থামেন নি। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'ব্যাপারটাকে স্পোর্টস আর ফান হিসেবে নাও বাবা; দেখবে একটুও কষ্ট থাকবে না।'

বাবা এবারও উত্তর দেন নি।

•

পরের দিন থেকেই ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন সুশোভন। তার বদলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে আর ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসগুলোতে হানা দিতে শুরু করেছিলেন। প্রত্যেক দিন নিয়ম করে দশটা অফিসে যেতেন। তাছাড়া খবর কাগজে বিজ্ঞাপন

দেখে গাদা গাদা অ্যাপ্লিকেসনও পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন। চাকরির ব্যাপারে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট, স্টেট গভর্নমেণ্ট আর পাবলিক সারভিস কমিশনের যত কমপীটিটিভ পরীক্ষা হত তার সবগুলোতে তিনি বসতেন।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি; মাস ছয়েকের মধ্যেই ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টে ইন্সপেক্টরের একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা আসার পর দৌড়তে দৌড়তে সোজা তিনি বাবার কাছে চলে এসেছিলেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর যে বিষাদ আর অসহায়তা চাক চাক বরফের মতো বাবার ওপর চেপে বসেছিল আস্তে আস্তে সে সব কেটে যাচ্ছিল। বলা যায় সুশোভনই তুড়ি মেরে মেরে বাবার দুঃখ-টুঃখ উড়িয়ে দিয়ে আবার তাঁকে সতেজ সজীব করে তুলছিলেন। ততদিনে ডাক্তাররা বাবাকে খবর-কাগজ আর একটু-আধটু বই-টই পড়তে দিয়েছিলেন। তবে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা কোন বই না; ভারহীন হাল্কা হিউমার-টিউমার। এ ছাড়া সমতল জায়গায় অনেকটা হাঁটতে দিয়েছিলেন। আরো একটা ব্যাপারে ডাক্তাররা হাতের মুঠো খানিকটা আলগা করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বাবাকে আবার গানের আসরে যেতে দিতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য সারা রাত জাগতে দিতেন না; খুব বেশি হলে সাড়ে ন'টা কি দশটা পর্যন্ত। তার বেশি এক সেকেণ্ডও নয়। মোট কথা ধীরে ধীরে হলেও বাবা তাঁর পুরনো হালকা আমুদে মেজাজটার অনেকখানিই ফিরে পাচ্ছিলেন।

যাই হোক অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা বাবার হাতে দিয়ে দারুণ উৎসাহের গলায় সুশোভন বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, আই হ্যাভ গট মাই ট্রফি।'

অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা এক পলক দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন বাবা, 'ট্রফি না, পেট্রোল—'

বুঝতে না পেরে সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পেট্রোল মানে?'

'হাসপাতাল থেকে বেরুবার পর তুই লং ডিসট্যান্স মোটর রেসের কথা বলেছিলি না? মনে পড়ছে?' বাবা অল্প অল্প হেসেছিলেন।

মনে পড়ে গিয়েছিল। সুশোভন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'দিস ইজ পেট্রোল।' অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ওপরে তুলে ফ্ল্যাগের মতো নাড়তে নাড়তে বাবা বলেছিলেন, 'ফুয়েল এসে গেছে। এবার গাড়িটা ঠিকমতো চলবে, কি বলিস ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ করে থেকে বাবা এবার বলেছিলেন, 'একটা কথা পাবু—'

'বল—'

'আমি নাইনটীনথ সেঞ্চুরির মানুষ। অনেস্টি, ইডিওলজি—এই সব ব্যাপারে আমার কিছুটা বাতিক আছে বলতে পারিস। এগুলো হল নাইনটীনথ সেঞ্চুরির ভাইরাস। আমার পিতৃদেব মানে তোর ঠাকুরদার মতো দু-চারজন ছাড়া যারাই ওই সময় জন্মেছে তাদের গায়েই এই ভাইরাস কামড় বসিয়েছে।'

বাবাকে থামিয়ে দিয়ে সুশোভন বলেছিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বল না।'

বাবা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, 'তুই যে চাকরিটা পেয়েছিস সেখানে কিন্তু অনেক রকম টেম্পটেসান রয়েছে। আমি চাই আমার ছেলে হানড্রেড পারসেণ্ট অনেস্ট থাকবে।'

'আই শ্যাল প্রুভ দ্যাট আই অ্যাম ইওর সান।'

'ওয়ার্ড অফ অনার ?'

'ওয়ার্ড অফ অনার।'

এবার বাবা এক কাণ্ড করেছিলেন। অমরেশ সমরেশ আর দিবাকরকে ডাকিয়ে এনে বলেছিলেন, 'তোমাদের একটা কথা বলব ; সারা জীবন সেটা মনে রাখতে চেষ্টা করো।' সুশোভনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, 'দিস বয়—মানে তোমাদের দাদা পাবু আজ একটা চাকরি পেয়েছে। মা-বাবা এবং ভাইদের জন্যে, মানে আমাদের গোটা ফ্যামিলির জন্যে সে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করল। কথাটা কখনও ভুলো না।'

সুশোভন বিব্রতভাবে বলেছিলেন, 'এ-সব কী বলছ বাবা ; এটা আমার ডিউটি।'

'প্লীজ স্টপ—'সুশোভনকে থামিয়ে দিয়ে বাবা তাঁর অন্য ছেলেদের লক্ষ্য করে বলে গিয়েছিলেন, 'এখন থেকে পাবু আমার জায়গায় এসে বসল। আমাকে যে সম্মান মর্যাদা তোমরা দাও, আমার ইচ্ছা পাবুকেও তাই দেবে ; মনে থাকবে ?'

তিন ভাই-ই জানিয়েছিল—থাকবে।

বাবার স্ট্রোক হবার পর সংসারটা ব্রেক-কষা গাড়ির মতো থমকে গিয়েছিল। সুশোভন চাকরিটা পেতেই সেটা আবার মোটামুটি মসৃণ ভাবেই চলতে শুরু করে দিল। ভাইরা তাদের পড়াশোনা করে যাচ্ছিল। বাবা খবর-কাগজ আর লাইট হিউমারের বই-টই পড়ে, সমতল জায়গায় হেঁটে, শীতকালে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনে জীবনের লম্বা দৌড় আস্তে আস্তে শেষ করে আনছিলেন।

সুশোভনের তখন নতুন চাকরি ; মাইনে-টাইনে খুব একটা বেশি না। তাতে এত বড় ফ্যামিলি এবং তিনটে ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ টানা যায় না। তাই সকাল এবং সন্ধ্যেয় দুটো মোটা পয়সার টুইশান যোগাড় করে নিয়েছিলেন। বাবাকে অবশ্য এটা জানানো হয়নি, জানালে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন।

এভাবে এত বড় একটা সংসার টেনে নিয়ে যেতে খুব খারাপ লাগেনি সুশোভনের। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে দুর্দান্ত একটা স্পোর্টসের মতো মনে হয়েছিল। রেসের মাঠে উল্কার মতো ছুটে যাওয়া ঘোড়ার পিঠে বসে পৌরুষদৃপ্ত কোন জকির যে রকম মনোভাব হয় ঠিক সেই রকম একটা উত্তেজনা আর মজা সর্বক্ষণ অনুভব করতেন সুশোভন। নিজেকে একজন অত্যন্ত বলশালী মানুষ বলে মনে হত তাঁর। নিজের ক্ষমতার ওপর তখন তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

মনে পড়ছে প্রতিদিন রাত্তিরে সুশোভনরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসতেন। দিনের বেলা এটা সম্ভব হত না। কেননা ভাইদের একেক-

জনের একেক সময় ক্লাস থাকত। কেউ সকাল আটটায়, কেউ বেলা একটায় খেয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু রাত্তিরে সবার একসঙ্গে বসে খাওয়া চাই-ই। এটা তাঁদের বাড়ির অনেক কালের রেওয়াজ।

খাওয়ার টেবলে বাবা এক দিকে বসতেন। তাঁর মুখোমুখি বসতেন সুশোভনরা চার ভাই। মা কাছে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে তাঁদের পাতে পাতে খাবার তুলে দিতেন।

খেতে খেতে নানারকম গল্প হত। তবে বেশিরভাগ গল্পই হত সুশোভনের অফিস এবং তাঁর কাজকর্মকে ঘিরে। কে দশ লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিতে চেয়েছিল, কে বছরের পর বছর কি কৌশলে তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছিল, কোন ফার্ম ভালো চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট রেখে আসল হিসেবের খাতা সরিয়ে দু-নম্বর খাতা বানিয়ে কম ট্যাক্স দেবার মতলব করেছিল এবং কিভাবে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট তাদের কারচুপি ধরে ফেলেছে, প্রতিদিন এ-সব গল্প বলতেন সুশোভন।

একদিন সুশোভন খাবার টেবলে বসে বলেছিলেন, 'জানো বাবা, আজ একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে।'

বাবা উৎসুক চোখে তাকিয়েছিলেন, 'কী রে ?'

'অফিস ছুটির পর বেরিয়েছি, একটা লোক হঠাৎ কোত্থেকে আমার পাশে এসে সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল। প্রথমটা খেয়াল করি নি। দু-তিন মিনিট হাঁটবার পর লোকটা আমার আরো কাছে ঘেঁষে এল ; তারপর গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে গেল। কি রকম একটা সন্দেহ হল। ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম, লোকটা মিডল-এজেড। মাথায় ব্যাক ব্রাশ-করা কাঁচা-পাকা চুল, দারুণ হ্যাণ্ডসাম আর স্মার্ট চেহারা, পরনে ঝকঝকে স্যুট। চোখাচোখি হতেই সে হাসল ; তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'স্যার, আপনি মিস্টার ব্যানার্জি তো ?' লোকটা নন-বেঙ্গলী ; তবে বাংলাতেই কথা বলছিল। তার বলার ভঙ্গিতে অবাঙালীদের মতো টান। আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না।'

লোকটা হাত কচলাতে কচলাতে একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে বলল, 'চিনবার কথা নয়। তবে আপনাকে আমি চিনি স্যার।' ঐ রকম একটা এজেড লোক বার বার 'স্যার' বলছে; আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। বললাম, 'আমার কাছে আপনার কি কিছু দরকার আছে?' লোকটা ঘাড় নুইয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।' আমি জানতে চাইলাম, 'কী দরকার?' লোকটা আগের মতোই হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'স্যার, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। যদি কিছু মনে না করেন, কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক। ধরুন কোন 'বার-টারে?' বললাম, 'পায়ের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমি একজন পারফেক্ট টীটোটেলার।' লোকটা মাথা নেড়ে নেড়ে বিনীতভাবে বলতে লাগল, 'আই নো, আই নো। আপনি হুইস্কি-টুইস্কি দূরের কথা, সুপুরি পর্যন্ত দাঁতে কাটেন না। ওয়ার্ল্ডে আপনার মতো অনেস্ট চরিত্রবান ইয়ং ম্যান খুব কমই দেখা যায় স্যার। সরি, মুখ ফসকে 'বারে'র কথা বেরিয়ে এসেছিল।' লোকটা ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়ে যেতে লাগল। আমার সন্দেহটা বেড়েই যাচ্ছিল। বললাম, 'আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন দেখছি।' লোকটা বিনীতভাবে বলল, 'অনেক আর কোথায় স্যার, একটু আধটু।'

'অবাক হয়ে বললাম, 'আমি আপনাকে জানি না, অথচ আপনি আমার খবর রাখেন। রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ!' লোকটা তার চমৎকার সাজানো দাঁতের সারি বার করে সুন্দর হাসল। তারপর বলল, 'কিছু কিছু লোকের খবর রাখা আমার কাজ স্যার। আপনি অনুমতি করলে কোন একটা ভালো রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসা যেতে পারে।' আমার অদ্ভুত লাগছিল, সেই সঙ্গে রাগও হচ্ছিল। কড়া গলায় বললাম, 'আপনাকে চিনি না, জানি না। কেন আপনার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় যাব? আটার ননসেন্স।' ভেবেছিলাম লোকটা এবার সরে পড়বে। কিন্তু আমার ধারণা একেবারে ভুল। লোকটা বিনয়ে এবার মোমের মতো গলে গেল যেন। বলল, 'চেনাশোনা হতে কতক্ষণ? ইটস্ নো প্রবলেম। একটা কথা আগেই বলে রাখছি আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। প্লীজ আসুন।'

রাস্তাঘাটে আমার যে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ঘুরে বেড়াচ্ছে, এত কাল টের পাই নি। সে যাক গে, রাগ যেমন হচ্ছিল তেমনি দারুণ এক কৌতূহলও আমাকে পেয়ে বসছিল যেন। আবার খানিকটা ভয় ভয়ও লাগছিল। লোকটা আমাকে কোনভাবে ফাঁসিয়ে টাঁসিয়ে দেবে না তো ? শেষ পর্যন্ত কৌতূহলটাই আমার নাকে বঁড়শির মতো আটকে গেল যেন। বললাম, 'ঠিক আছে চলুন। তবে আমি কিছু খাব না।' লোকটা হাসল ; কিছু বলল না। আমরা একটু বাদে একটা এয়ার-কণ্ডিশানড রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম।'

টেবলের উল্টোদিকে বাবা আর এদিকে অমরেশ সমরেশ এবং দিবাকর শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে ছিল। চারজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'তারপর—'

সুশোভন একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'রেস্তোরাঁয় খুব একটা ভিড়টিড় ছিল না। আমরা একটা ফাঁকা টেবলে গিয়ে বসলাম। লোকটা বেয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিল ; তাকে থামিয়ে বললাম, 'আগে আপনার কাজের কথাটা সারুন।' লোকটা হেসে বলল, 'হ্যাটস্ রাইট। আমার নাম মানেকলাল্ মেহতা। ইউ মে টেক মী ফর এ ফ্রেণ্ড। আপনার কাছে আমার একটা প্রোপোজাল আছে।' প্রোপোজালটা কী জানতে চাইলাম। লোকটা অর্থাৎ মানেকলাল বলতে লাগল, 'আপনি একজন খুবই সৎ মানুষ। দিস ইজ রিয়ালি গুড টু বী অ্যান অনেস্ট ফেলো। কিন্তু কথাটা হচ্ছে স্যার, এটা হল মেটিরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড। এখানে টিকে থাকতে হলে একটা জিনিসের খুবই দরকার। জিনিসটা কী, পরে বলছি। তার আগে আরো দু-একটা কথা বলে নিই। আমি জানি আপনার বাবার একটা সীরিয়াস করোনারি অ্যাটাক হয়ে গেছে। তাঁর পক্ষে বাকী লাইফের জন্য আর কাজকর্ম করা সম্ভব না। আপনার ভাইরা এখনও স্টুডেণ্ট। গোটা ফ্যামিলির দায়িত্ব এখন আপনার ওপর। সংসার চালাবার জন্যে নিজের বাবাকে লুকিয়ে আপনাকে ছুটো টুইশান করতে হয়।' মানেকলালের কথা শুনতে শুনতে আমি চমকে উঠেছিলাম। লোকটা আমার এত খুঁটিনাটি ব্যাপার জানলো কোত্থেকে

মনে হচ্ছিল সে আমার আর আমাদের বাড়ির প্রত্যেকটা লোকের পেছনে ঘুরে ঘুরে সব খবর যোগাড় করেছে। তার উদ্দেশ্য ধরতে পারছিলাম না বলে ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল ; কিছুটা ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে মানেকলালকে বুঝতে না দিয়ে বললাম, 'প্লীজ মেক ইট শর্ট। আমার ফ্যামিলি-হিস্ট্রি আমাকে শোনাবার দরকার নেই। কাম টু দি রিয়াল পয়েন্ট।' মানেকলাল খুব খুশী হয়ে গেল যেন। বলল, 'ঠিক বলেছেন স্যার ; ঠিক বলেছেন। দ্যাটস্ রিয়ালি ভেরি মাচ বিজনেস লাইক। আমি আসল কথাতেই আসছি। কিন্তু তার আগে স্যার শুধু একটা অন্য কথা বলার পারমিসান দিন। হ্যাঁ, তখন যা বলছিলাম—এই মেটিরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে টিকে থাকতে হলে যা দরকার তা হল টাকা। মানি, মানি, অ্যাণ্ড মানি।' বলেই আমার দিকে ঝুঁকল মানেকলাল। তারপর গলার স্বরটা ঝপ করে নিচে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে আবার বলল, 'আপনারও নিশ্চয়ই টাকার দরকার।' লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি বলতে চান?' মানেকলাল বলল, 'ইটস্ প্লেন অ্যাণ্ড ভেরি সিম্পল স্যার। টাকার কি রকম দরকার আপনি নিজেই জানেন স্যার। ইচ্ছা করলে আপনি কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা পেতে পারেন।' বলে ঠোঁট টিপে চোখ দুটো অল্প অল্প কুঁচকে হাসতে লাগল মানেকলাল।'

ডাইনিং টেবলের ওধার থেকে বাবা আর এধার থেকে ভাইরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'তারপর—'

সুশোভন আবার শুরু করলেন, 'লোকটার কথা শুনে আমার মাথার ভেতর বোঁ বোঁ করে একটা চাকা ঘুরতে লাগল যেন। অফিস থেকে মাইনে পাই সাড়ে সাত শো টাকা, দুটো টুইশান করে আড়াই শো। মোট এক হাজার টাকা যার মান্থলি ইনকাম তাকে লোকটা লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কৌতূহলও হচ্ছিল। বললাম, 'কি করে অত টাকা পাব?' মানেকলাল টেবলের ওপর আস্তে টোকা দিতে দিতে আচমকা ঝুঁকে আমার মুখের কাছে তার মুখটা নিয়ে এল। তারপর খুব চাপা গলায় বলল, 'যদি আমার

কথামতো চলেন। আগেই বলেছি আমি আপনার একজন অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। আর আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমানও। আমার ধারণা আপনি আমার কথামতোই চলবেন। তাতে আমার আপনার দুজনেরই লাভ।' একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'আপনার কথা না শুনে আগে থেকে কিছু বলতে পারব না।' মানেকলাল জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'রাইট, ভেরি রাইট স্যার। আমার কথা নিশ্চয়ই আগে শুনবেন। কথাটা হল, আপনার টাকার ব্যবস্থাটা আমি করব। তার বদলে আপনাকেও কিছু করতে হবে। মানে ইউ ডু সামথিং ফর মী অ্যাণ্ড আই ডু সামথিং ফর ইউ। মানেএটা হল আপনার আমার মধ্যে একটা মিউচুয়াল ব্যাপার, জেণ্টলম্যানস্ এগ্রিমেণ্টও বলতে পারেন। ও-কে স্যার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজটা কী করতে হবে তা-ই বলুন।' মানেকলাল একটু কি ভাবল। খুব সম্ভব মনে মনে তার বক্তব্যটাকে গুছিয়ে নিল। তারপর, বলল, 'স্যার, আপনার হাতে অনেকগুলো কোম্পানির আর নামকরা ফ্যামিলির ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল আছে। ফাইলগুলোর কয়েকটা এদিক-ওদিক করে দিতে হবে; আর দু-তিনটে কায়দা করে নষ্ট করে দেবেন। তবে একদিনে নয়। আপনাকে সেফ সাইডে থাকতে হবে তো। আস্তে আস্তে, ধরুন দেড় বছর কি দু বছরের একটা প্ল্যান নিয়ে এই কাজগুলো করবেন। এমনভাবে করবেন যাতে ধরা পড়লেও সব দায়িত্বটা অন্যের ঘাড়ে চেপে যায়। কিভাবে এটা করা সম্ভব সেই মাস্টার প্ল্যানটা আপনাকেই ভেবে বার করতে হবে। কাজগুলো ঠিকমতো হয়ে গেলে আপনি মোট তিন লাখ টাকা পাবেন।' এক নিঃশ্বাসে এই পর্যন্ত বলে মানেকলাল একটু থামল। শুনতে শুনতে ভয়ে আমার মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছিল; গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিলাম; গলাটা শুকিয়ে শিরীষ কাগজের মতো খসখসে হয়ে উঠেছিল। আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি। মানেকলাল আবাব বলল, 'আপনাকে এর জন্যে কাল বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে দিতে চাই। দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ইনস্টলমেণ্ট। কোথায় কিভাবে টাকাটা দেব বলুন।' ভয়ে ভয়ে

বললাম, 'আমার পক্ষে এ-সব করা সম্ভব না। আমার নার্ভ ভীষণ উইক।' মানেকলাল হাসল, 'টাকাটা হাতে এলেই নার্ভ স্ট্রং হয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'এ জাতীয় কাজ কখনও করি নি ; দিস ইজ ক্রাইম।' মানেকলাল নাক কুঁচকে হাসল, 'অনেস্টি! মিস্টার ব্যানার্জি—স্যার, আপনি ইয়ং ম্যান। কত বয়স হবে? হার্ডলি টোয়েন্টি ফোর অর টোয়েন্টি ফাইভ। এটা হল টাকা কামানোর বয়স। ত্ব'হাতে স্ক্রুপুলাসলি অর আনস্ক্রুপুলাসলি টাকা তুলে নিন। লক্ষ্মী নিজে পা বাড়িয়ে ঘরে ঢুকতে চাইছে ; তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন না। পরে আপশোস করতে হবে। আর অনেস্টি? অনেস্টির একটা সীজন আছে স্যার ; সেটা ওল্ড এজের জন্যে সংরক্ষিত করে রাখুন।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল মানেকলাল, 'তখন কলকাতার কোন 'পশ' লোকালিটিতে ফ্যাশনেবল বাড়ি করে থাকবেন। পোর্টিকোর তলায় চারখানা ইমপোর্টেড গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে। চমৎকার করে সাজানো ড্রইংরুমে বসে সেই ওল্ড এজে অনেস্টি সম্পর্কে দারুণ দারুণ বাণী দেবেন। বলতেও ভালো লাগবে। যারা শুনবে তারাও কথাগুলোর ইম্পর্টেন্স দেবে। কিন্তু যদি টাকা না থাকে, দামী গাড়ি-বাড়ি না থাকে, কেউ আপনার একটা কথাও কানে তুলবে না। তাই বন্ধু হিসেবে ওয়েল-উইশার হিসেবে বলছি যে সীজনের কাজ সেই সীজনে করুন।' মানেকলালের কথা শুনতে শুনতে আমার মাথায় দারুণ একটা আইডিয়া এসে গেল। খানিকক্ষণ আগের সেই ভয়ের ভাবটাও সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাচ্ছিল। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, চলুন।' অবাক হয়ে মানেকলাল জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?' আমি বললাম, 'যেখানে টাকাটা দেবেন সেই জায়গাটা তখন দেখতে চাইলেন না?' মানেকলাল ভীষণ খুশী হয়ে গেল, 'আপনি তাহলে রাজী?' তার কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'আর বসে থাকবেন না। প্লীজ—' আমার তাড়াহুড়ো দেখে মানেকলাল হয়ত ভাবল আমাকে বঁড়শিতে গাঁথে ফেলতে পেরেছে। হেসে হেসে সে বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন স্যার? কথাবার্তা যখন পাকা হয়ে গেছে তখন টাকাটা নিশ্চয়ই

আপনি পারেন। জায়গাটা দেখব তো বটেই। তার আগে আপনাকে এণ্টারটেন করার একটু সুযোগ দিন। বয়টাকে এবার কিন্তু ডাকছি।' মানেকলালকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার অন্য একটা কাজ আছে। আর বসা সম্ভব না।' মানেকলাল অগত্যা উঠে পড়ল। আপশোসের গলায় বলতে লাগল, 'আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে স্যার। আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল ; রেস্তোরাঁ পর্যন্তও নিয়ে এলাম। অথচ কিছুই খেলেন না। আরেক দিন কিন্তু আপনার সুবিধা মতো আমরা কোথাও লাঞ্চ কি ডিনার খাব।' আমি বললাম, 'দেখা যাক।' রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম। এ-রাস্তা সে-রাস্তা এবং নানারকম অলিগলি পেরিয়ে চলেছি তো চলেইছি। আমার গায়ের সঙ্গে জুড়ে থেকে মানেকলালও হেঁটেই যাচ্ছে আর থেকে থেকেই বলে উঠছে, 'আর কত দূর স্যার?' আমিও তাকে বলে যাচ্ছি, 'এই তো এসে গেছি। আর একটু—' হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত যে বাড়িটার সামনে এসে আমি থামলাম সেটা দেখে মানেকলাল আঁতকে উঠল, 'এ কি! এটা তো পুলিস হেড কোয়ার্টার!' আমি হেসে হেসে বললাম, 'জানি, ভেতরে চলুন।' মানেকলাল অবাক হয়ে বলল, 'এখানে কী হবে!' বললাম, 'যে ফার্স্ট ইনস্টলমেণ্টটা দিতে চাইছেন সেটা আমি এখানে পুলিস অফিসারদের সামনে বসে নিতে চাই। আসুন আসুন—' মানেকলাল চমকে উঠল। সব রক্ত চোখের পলকে নেমে গিয়ে তার মুখটা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল যেন। তার পরেই বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। আমার মতলব ততক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে সে। উর্ধ্বশ্বাসে মানেকলাল রাস্তার দিকে দৌড় লাগাল ; তারপর লাফ দিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। আর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমি হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে আমার পিঠ দুমড়ে যেতে লাগল।' বলে একটু থামলেন সুশোভন। বাবা এবং ভাইদের দিকে ধীরে ধীরে একবার তাকিয়ে মজার গলায় বললেন, 'তিন লাখ টাকা হাতে আসতে আসতে ফসকে গেল। ব্যাড লাক—'

টেবলের ওপারে বাবা এতক্ষণ দম-আটকানো মানুষের মতো

বসেছিলেন। আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেসন মাই বয়। চব্বিশ বছর বয়সে তুমি তিন লাখ টাকার টেম্পটেসন জয় করেছ। ইটস অ্যান অ্যাচিভমেণ্ট। তোমার জন্যে আমি গর্ব বোধ করছি। গড ব্লেস ইউ।' বলতে বলতে বাবার গলা বুজে গেছে, তাঁর চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল।

মনে পড়ছে পরের দিন অফিসে যাবার পর মানেকলালের ফোন এসেছিল। সে বলেছিল, 'মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার অনেস্টিকে আমি এক হাজার বার সেলাম করছি। তিন লাখ টাকার টেম্পটেসান চেক করতে পারে, এরকম লোক আমার বাহান্ন বছরের লাইফে এই প্রথম দেখলাম। আপনি কি বুদ্ধ চৈতন্য যীশু কিংবা রামকৃষ্ণ পরমহংস হতে চান?'

সুশোভন কড়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি বলতে চান আপনি?'

'স্যার, আমি প্রথমে আপনাকে দারুণ ইনটেলিজেণ্ট ভেবেছিলাম। এখন দেখছি আপনি একটা 'ফুল'। কি করে ভালোভাবে বাঁচতে হয় জানেন না। কেউ সেই অপরচুনিটি করে দিলেও নিতে চান না। সাধু-মহারাজ-টহারাজ যদি হতে চান তাহলে আর মানুষের মধ্যে আছেন কেন? চাকরি-টাকরি করবারই বা কি দরকার?'

'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

'আছে স্যার, আছে। আপনি কাজের লোক; গল্প করার জন্যে কি আর ফোনটা করেছি। বলছিলাম কি, আমার প্রোপোজালটা আরেকবার বিবেচনা করুন।'

'ডোণ্ট ডিস্টার্ব মী। বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই।'

মানেকলাল বলেছিল, 'আমার কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। আমি আপনার একজন ওয়েল-উইশার। আপনাকে এক্ষুনি কোন কথা দিতে বলছি না। দু'-চারদিন পর আবার ফোন করব।'

আর একটা কথাও না বলে লাইন কেটে দিয়েছিলেন সুশোভন।

এরপর থেকে প্রায়ই ফোন করত মানেকলাল। কোন দিন সে বলত, 'আমার কথাটা ভেবে দেখেছেন?'

রূঢ় গলায় সুশোভন উত্তর দিতেন, 'না। ভাববার প্রয়োজন বোধ করি নি। আপনি আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।'

'মাঝে মাঝে ফোন আমাকে করতেই হবে স্যার। করতে করতে একদিন আপনাকে নিশ্চয়ই বোঝাতে পারব, আমার কথামতো চললে আলটিমেটলি আপনার লাভই হবে। আমি স্যার আপনার গায়ে জোঁকের মতো ঝুলেই থাকছি।' বলে অদ্ভুত ঢেউ তুলে তুলে হাসত মানেকলাল।

সুশোভন রেগে উঠতেন, 'রট—' বলেই ঝড়াং করে টেলিফোনটা ক্রেডেলে রেখে দিতেন।

কোনদিন হয়ত মানেকলাল বলত, 'গুড মর্নিং স্যার। আশা করি আজ একটা সুখবর পাব।'

জামার ভেতর পোকা হেঁটে যাবার মতো সব সময় এই লোকটা সুশোভনকে দারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে রেখেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বলতেন, 'না; এই লাইফে সুখবরটা পাবার কোন আশা নেই।'

'দেখা যাক; আমি স্যার লেগেই রইলাম। আমার বুলডগ টেনাসিটি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

দারুণ উৎসাহের গলায় মানেকলাল বলত, 'একটা কেন স্যার, আপনি পঞ্চাশটা জিজ্ঞেস করুন না।'

সুশোভন বলতেন, 'ঐ কোম্পানি আর লোকগুলো সম্বন্ধে, মানে আমার কাছে যাদের ফাইল রয়েছে—আপনার এত ইন্টারেস্ট কেন?'

'স্যার, আমি একজন কমিশন এজেন্ট। মিডলম্যানও বলতে পারেন। আপনাকে দিয়ে যদি কাজ করিয়ে দিতে পারি আমিও টু-পাইস পেয়ে যাব। ভেবে দেখুন আমার কথায় রাজী হলে দুজনেরই লাভ।'

'দয়া করে আপনি আর ফোন করবেন না। ফর গডস্ সেক—'

এইভাবেই তিনটে বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে সুশোভনদের

পারিবারিক প্যাটার্নে কোনরকম অদল বদল হয় নি। শুধু অমরেশ বা অমু মেডিক্যাল কলেজ থেকে ভালো রেজাল্ট করে বেরিয়ে এসেছিল।

বাবা অমরেশকে বলেছিলেন, 'এবার থেকে পাবুকে তুই রিলিফ দিবি। যেমন করে হোক একটা চাকরি যোগাড় করে ফেল। ফেলতেই হবে।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'এক্ষুনি চাকরি করার কি দরকার। অমু এম-ডি'টা করে নিক না।'

বাবা বলেছিলেন, 'নো। আমি একটা ছেলের ঘাড়ে হোল ফ্যামিলির ওয়েট চিরকাল চাপিয়ে রাখতে চাই না।'

অমরেশও বলেছিল, 'তুমি ঠিক বলেছ বাবা, দাদা আমাদের জন্যে অনেক করেছে। আমি আর পড়ব না। এবার দাদার কাছ থেকে সংসারের খানিকটা দায়িত্ব আমাকে নিতেই হবে।

অমু খুবই ভালো ছেলে। সুশোভনকে সে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। সুশোভন সম্পর্কে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল তার। সত্যি সত্যিই সে আর পড়ে নি। মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে বছরখানেক একটা হাসপাতালে হাউস সার্জেন হয়ে থেকেছে। তারপর নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত একটা জুট মিলে জুনিয়ার মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি যোগাড় করে ফেলেছিল। কোম্পানি থেকে অমরেশকে কোয়ার্টার দিয়েছিল; অমরেশ সেখানে থাকত না। বাড়ি থেকে যাতায়াত করত। মনে আছে চাকরি পাবার পর সুশোভনকে সে আর টুইশান করতে দেয় নি; জোরজার করে ওটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এই সময় বাবা একটা কাণ্ড করে বসলেন। একদিন রাত্তিরে একটা মিউজিক কনফারেন্স থেকে ফিরে ছেলেদের নিয়ে ডাইনিং টেবলে খেতে বসেছিলেন। খেতে খেতে হঠাৎ সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা পাবু, ক্লাসিক্যাল মিউজিক তোর কেমন লাগে?'

গান ভালই লাগত সুশোভনের। তবে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ আর রজনীকান্তর গানই ছিল তাঁর ফেভারিট। ধ্রুপদ কি খেয়াল সম্বন্ধে

তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বড়ে গোলাম, ফৈয়াজ খাঁ কি ভীষ্মদেবের কিছু রেকর্ড বাড়িতে ছিল। মাঝে মধ্যে সেগুলো শুনেছেন। তবে রাত জেগে কনফারেন্সে কনফারেন্সে ঘুরে গান শোনার বাতিক বা শখ তাঁর কোনদিনই ছিল না। যাই হোক বাবার কথা শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। কেননা তাঁর সাতাশ আটাশ বছরের জীবনে বাবা কখনও গান-বাজনা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি বা তাঁর মতামত জানতে চান নি। অবাক হয়ে সুশোভন বলেছিলেন, 'কী ব্যাপার, ওয়ার্ল্ডে এত জিনিস থাকতে ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে জানতে চাইছ?'

বাবা চোখ কুঁচকে হাসতে হাসতে মজা করে বলেছিলেন, 'দরকার আছে মাই বয়। এখন থেকে তোমাকে ক্লাসিক্যাল গানের সমঝদার হতে হবে।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়েছিলেন সুশোভন, 'তার মানে?'

'মানেটা এখন বলব না। আপাততঃ ওটা মিস্ট্রি হয়েই থাক। কাল সন্ধ্যেবেলা তোর কোন কাজ আছে?'

'না। কাজ থাকবে কি করে; অমু তো টুইশানগুলো ছাড়িয়েই দিয়েছে।'

'গুড। এক কাজ করবি, ঠিক সাড়ে ছ'টায় অন দি ডট—মহাজাতি সদনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

'কেন বল তো?'

'কালই জানতে পারবি। এত ফেমিনিন কিউরিওসিটি ভাল না।'

'অল রাইট।'

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্তিরে শুতে গিয়ে সুশোভনের মনে হয়েছিল, বাবার সেই কথাটা অদৃশ্য ঘুণপোকার মতো মাথার ভেতর কুর কুর কেটে চলেছে। মহাজাতি সদনের কাছে কেন যেতে বললেন বাবা? বিদ্যুৎ চমকের মতো আচমকা সুশোভনের মনে হয়েছিল, আরে ওখানে হল ভাড়া নিয়ে মাঝে মাঝে তো মিউজিক কনফারেন্স হয়। তক্ষুনি সেদিনকার খবর-কাগজ যোগাড় করে পাতা ওলটাতে

ওলটাতে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে গিয়েছিল। যা ভেবেছিলেন তা-ই। 'কলাকেন্দ্র' নামে একটা সংস্থা মহাজাতি সদনে তিন দিনের ক্লাসিক্যাল গান এবং নাচের আয়োজন করেছে। বিজ্ঞাপনে অসংখ্য শিল্পীর নাম রয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই বিখ্যাত। নামকরাদের ভিড়ে দু-একটা নতুন নামও অবশ্য দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ এতকাল পরে বাবা তাঁকে কেন যে ক্লাসিক্যাল গানের সমঝদার করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেদিন বুঝতে পারেন নি সুশোভন। বুঝেছিলেন তার পরের দিন।

কথামতো সন্ধ্যেবেলা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাড়ে ছ'টায় মহাজাতি সদনের সামনের ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুশোভন। দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর কী করবেন যখন বুঝতে পারছেন না সেই সময় বাবা এসে গিয়েছিলেন। ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, 'একটু লেট হয়ে গেল। কি করব বল, বি-টি রোডে জ্যাম ছিল, বাসটা আসতে দেরি করে ফেলল—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'তুমি কি বাড়ি থেকে এলে ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, এবার বল এখানে কি জন্যে আসতে বলেছিলে—'

বাবা বলেছিলেন, 'গান শুনবার জন্যে। আয়—' সুশোভনকে নিয়ে তিনি সোজা হলের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

কাল রাত্তিরে সুশোভন মোটামুটি ভেবেই নিয়েছিলেন বাবা তাঁকে মিউজিক কনফারেন্সে গান শোনাতে নিয়ে যাবেন। দেখা গিয়েছিল তাঁর ধারণাটা ঠিক।

গেটের কাছে আসতেই তিন চারজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বাবার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। রীতিমত সম্ভ্রমের গলায় বলেছিলেন, 'আসুন, আসুন—' তাঁদের সবার বুকেই সিল্কের ব্যাজ আঁটা। তা দেখে বোঝা গিয়েছিল তাঁরা এই কনফারেন্সের কর্মকর্তা-টর্তা।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ফাংশান শুরু হয়ে গেছে ?'

কর্মকর্তাদের একজন বলেছিলেন, 'না। আপনি আসেন নি ; শুরু হবে কি করে ?'

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ঠিক সাড়ে ছ'টায় ফাংশান আরম্ভ হবে। তখন পৌনে সাতটা বাজতে চলেছে। সুশোভন আগেই জানতেন বাবা কলকাতার সব বড় বড় মিউজিক কনফারেন্সের একজন পেট্রন। কিন্তু তিনি না আসা পর্যন্ত যে ফাংশান আটকে থাকে, এটা জানা ছিল না।

বাবা লজ্জিতভাবে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। বলেই ব্যস্তভাবে সুশোভনের দিকে ফিরেছিলেন, 'চল—চল—' অডিটোরিয়ামের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে পড়তে বাবা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, 'আমার সেই আর্টিস্টটি আজ গাইছে তো ?'

কর্মকর্তারা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। আপনি বলে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সঙ্গে কনট্যাক্ট করে প্রোগ্রাম দিয়ে দিয়েছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। ও এসে গেছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ; ব্যাক স্টেজে আছেন। সঙ্গে ওঁর মা-বাবাও এসেছেন। বলেছেন আপনি এলেই যেন খবর দিই। আপনি কি একবার ব্যাক স্টেজে যাবেন ?'

'এখন না, ওর গান হয়ে যাবার পর যাব। অনেক দেরি হয়ে গেছে ; এখন ফাংশান আরম্ভ করে দিন।'

সুশোভনকে নিয়ে এবার সোজা অডিটোরিয়ামের ভেতর চলে গিয়েছিলেন বাবা। আগেই সীটের ব্যবস্থা করা ছিল। একেবারে ফার্স্ট রো-তে দু'জনে পাশাপাশি বসেছিলেন। সুশোভন লক্ষ্য করেছিলেন গোটা হলটা দর্শকে বোঝাই ; কোথাও একটা সীট খালি পড়ে নেই।

উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। সামনের দিকে উঁচু ডায়াস ; সেখানে মেরুন রঙের রেশমী পর্দা ঝুলছিল।

একটু পরেই অডিটোরিয়ামের আলো আস্তে আস্তে নিভে গেল ;

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পর্দাও উঠল। সুন্দর করে সাজানো মঞ্চে তখন দু-দিক সঙ্গে পিচকিরির মতো রঙীন আলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কনফারেন্সের অর্গানাইজারদের একজন মাইকের সামনে এসে সেদিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে ঘোষণা করেছিলেন, 'আজকের ফাংশানে প্রথমেই ভারত নাট্যমের একটি অনুষ্ঠান হবে। নাচবেন—' একজন নৃত্যশিল্পীর নামও বলেছিলেন তিনি।

নামটা ভুলে গেছেন সুশোভন। তবে এটুকু মনে আছে সাউথ ইণ্ডিয়ার একটি তরুণী হাতের নানা মুদ্রায় এবং পদক্ষেপে ভারতের এক প্রাচীন নৃত্যধারাকে জীবন্ত করে তুলেছিল। মঞ্চের একধারে নাচের সঙ্গে তাল রেখে হারমোনিয়াম আর তবলা কখনও দ্রুত কখনও ধীরে বেজে যাচ্ছিল। একটি মধ্যবয়সী গায়িকা গান গেয়ে গেয়ে নাচের বিষয়টিকে দর্শকদের কাছে আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তুলছিলেন।

ভারত নাট্যমের পর সেই অর্গানাইজার ভদ্রলোক এসে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'এবার উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী পরমা চট্টোপাধ্যায়।'

এই নামটা আগে থেকেই সুশোভনের চেনা। রেডিওতে এর আধুনিক এবং রবীন্দ্রসংগীত তিনি শুনেছেন। তবে সে যে ক্লাসিক্যাল গানও গায়, এটা সুশোভনের জানা ছিল না। পরমাকে আগে তিনি দেখেনও নি।

ঘোষণার পর একটা লোক তানপুরা নিয়ে মঞ্চে এসেছিল; আরেকটা লোক নিয়ে এসেছিল বাঁয়া-তবলা। এক মিনিটও পার হয় নি, এবার যে মঞ্চে এসেছিল তার দিকে তাকিয়ে অডিটোরিয়ামের এক দেড় হাজার দর্শকের চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল। মঞ্চে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল তার জোর যেন হঠাৎ দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সুশোভন বুঝতে পেরেছিলেন এই মেয়েটিই পরমা চট্টোপাধ্যায়।

তার গায়ের রঙ গলানো গিনির মতো। পাতলা নাকটা সোজা কপাল থেকে নেমে এসেছে। সরু ভুরুর তলায় দীর্ঘ ভাসা ভাসা চোখ,

রক্তাভ ঠোঁট, গলাটা যেন সোনার ফুলদানি। মাখন দিয়ে তৈরি দুটো সুগোল নরম হাত কাঁধ থেকে সোজা নেমে এসেছে।

সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতোই লম্বা পরমা। তার পরনে সেদিন ছিল দুধের মতো ধবধবে টাঙ্গাইল শাড়ি ; শাড়িটার নকশা-করা চওড়া লাল পাড়ে সোনালি জরি বসানো। পরমার গলায় ছিল সোনার সরু হার ; মীনে করা চৌকো লকেটটা বুকের কাছে ঝুলছে। কানে পাথর বসানো কানফুল, ডান হাতের মধ্যমায় সাদা পোকরাজের আংটি। পরমাকে মঞ্চের মাঝখানে অলৌকিক স্বপ্নের দেশের পরী বলে মনে হচ্ছিল।

মনে আছে দু' হাত জোড় করে মাথাটা অল্প ঝুঁকিয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করেছিল পরমা। তারপর মঞ্চের ঠিক মাঝখানে ধীরে ধীরে বসে তানপুরাটা কোলে তুলে নিয়েছিল। এর মধ্যে তবলচিটাও ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে তবলাটাকে সুরে বেঁধে নিয়েছে।

একটু পর ফুলদানির মতো সুঠাম গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়ে আস্তে আস্তে তানপুরায় ঝংকার তুলে পরমা গানের আলাপ শুরু করেছিল।

বাবা পাশ থেকে সুশোভনকে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, 'মালকোষ গাইছে।'

ক্লাসিক্যাল মিউজিকের রাগরাগিণী সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না সুশোভনের। মঞ্চের দিকে চোখ রেখেই তিনি আধফোটা গলায় শুধু বলেছিলেন, 'ও—'

আলাপ থেকে ক্রমশ তান লয় এবং বিস্তারের দিকে গানটাকে নিয়ে যাচ্ছিল পরমা। মনে হচ্ছিল যেন হাজারটা অদৃশ্য সুরের পাখি তার গলা থেকে বেরিয়ে গোটা অডিটোরিয়ামে উড়ে বেড়াচ্ছে। যখনই গানটা এক একটা সমের মাথায় আসছিল অমনি চার পাশ থেকে শ্রোতারা বলে উঠছিল, 'বাহ্, বাহ্—'

একটা গান শেষ হবার পর আরেকটা গান ধরেছিল পরমা। বাবা পাশ থেকে আবার বলেছিলেন, 'এটা জয়-জয়ন্তী রাগ।'

সুশোভন আগের মতোই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ও—' আসলে পরমার ওপর থেকে তিনি চোখ সরাতে পারছিলেন না।

আগের মতোই পরমা তার কণ্ঠ থেকে সুরের পাখিদের উড়িয়ে দিচ্ছিল। গান শুনতে শুনতে আর পরমাকে দেখতে দেখতে আবছা ভাবে সুশোভনের মনে হয়েছিল, বাবা চোখের কোণ দিয়ে তাঁকে বার বার লক্ষ্য করেছেন আর ঠোঁট টিপে নিঃশব্দে হেসেছেন।

গান শেষ হবার পর গোটা অডিটোরিয়াম জুড়ে শুধু হাততালি আর হাততালি। তার মধ্যে রানীর মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল পরমা। দুই হাত জোড় করে শ্রোতাদের নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

পরমা চলে যেতেই বাবা উঠে পড়েছিলেন। সুশোভনকে বলেছিলেন, 'চল, একবার ব্যাক স্টেজে যেতে হবে।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে সুশোভন বলেছিলেন, 'বাবা, এইমাত্র যে গেয়ে গেল সে-ই তোমার আর্টিস্ট নাকি? একে তুমি এখানকার কনফারেন্সে প্রোগ্রাম পাইয়ে দিয়েছ?'

'ইয়েস মাই বয়—' সুশোভনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বাবা বলেছিলেন, 'খুঁজে খুঁজে কি রকম এক আর্টিস্ট বার করেছি, দেখলি তো?'

সুশোভন উত্তর দেন নি।

ব্যাক স্টেজের দিকে যেতে যেতে বাবা আবার বলেছিলেন, 'পরমার গান কেমন লাগল রে?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'ভালো।'

'দেখতেও চমৎকার—না?'

সুশোভন কিছু বলতে গিয়েও থমকে গিয়েছিলেন। অচেনা একটি মেয়ের রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে নিজের বাবার সঙ্গে আলোচনা করাটা খুবই অশোভন।

বাবা কিন্তু চুপ করে থাকেন নি। মুখটা শিশুর মতো সরল করে এবার বলেছিলেন, 'তুই কি রে, সুন্দরকে সুন্দর বলতে আপত্তিটা কিসের?'

সুশোভন থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, 'না, মানে—'

ব্যাক স্টেজে আসতেই চোখে পড়েছিল প্রচুর লোকজনের মধ্যে পরমা দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কনফারেন্সে দুটো গান গাইতেই অসংখ্য ভক্ত জুটে গিয়েছিল তার। চারদিক থেকে মুগ্ধ ফ্যানেরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

বাবাকে দেখতে পেয়েই ভিড় ঠেলে পরমা দৌড়ে কাছে চলে এসেছিল। তার পেছন পেছন একজন দারুণ সুন্দর চেহারার মধ্যবয়সী মহিলা আর সুপুরুষ এক প্রৌঢ়ও। চেহারার আদল দেখে বোঝা গিয়েছিল ওঁরা পরমার বাবা আর মা।

বাবা বলেছিলেন, 'কনগ্র্যাচুলেসনস পরমা। খুব ভালো গেয়েছ তুমি।'

পরমা নীচু হয়ে বাবাকে প্রণাম করতে করতে বলেছিল, 'সব আপনার জন্যে কাকাবাবু।' পরমার দু কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে বাবা বলেছিলেন, 'নাথিং নাথিং, আমার জন্যে আবার কি! সবটুকু ক্রেডিট তোমার।'

'আপনি সুযোগ না করে দিলে কনফারেন্সে কি গাইতে পারতাম?'

আদরের ভঙ্গিতে পরমার কপালে আলতো টোকা দিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'কনফারেন্সে অনেককেই তো গাইবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি কিন্তু তোমার মতো ক'জন গাইতে পেরেছে! তোমার গান শুনে অডিয়েন্স খুশী; আই অ্যাম ভেরি ভেরি ভেরি হ্যাপি।'

সেই প্রৌঢ় সুপুরুষ ভদ্রলোকটি এবার বলেছিলেন, 'আপনি যাই বলুন প্রফেসর ব্যানার্জি, আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

সুন্দর চেহারার মহিলাটি বলেছিলেন, 'আপনার ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না।'

বাবা বলেছিলেন, 'এ-সব ফর্মালিটির কথা আর যদি বলেন আমি কিন্তু চলে যাব। এগুলো শুনতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আই ফিল রিয়ালি আনকমফোর্টেবল।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'ঠিক আছে, আর বলব না।'

এতক্ষণে সুশোভনের কথা মনে পড়েছিল। ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, 'ঐ দেখুন আসল কাজটাই একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আসুন আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। এই হল আমার ছেলে সুশোভন; ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।' সুশোভনের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'আর এঁরা হলেন অজিতেশবাবু আর শান্তিসুধা দেবী—পরমার মা-বাবা। আর পরমাকে তো একটু আগে ডায়াসে দেখেছিসই। শী নীডস নো ইনট্রোডাকসন।'

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে সোসাল প্যাটার্নটা অন্যরকম ছিল। এখনকার মতো এত অশ্রদ্ধা আর দুর্বিনীত বেপরোয়া ভাব যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। বয়স্কদের সম্পর্কে তখনও একটু-আধটু শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। সুশোভন ঝুঁকে পরমার মা-বাবাকে প্রণাম করেছিলেন।

অজিতেশ আর শান্তিসুধা একই সঙ্গে বলেছিলেন, 'বাঃ, ভারি সুন্দর ছেলে আপনার।'

বাবা বলেছিলেন, 'দেখতে চেয়েছিলেন। দেখিয়ে দিলাম।'

সুশোভনের চমক লেগেছিল। বেশ অবাকও হয়েছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে অজিতেশ এবং শান্তিসুধার সঙ্গে বাবার কিছু কথা-টথা হয়েছে। কী কথা, কে জানে।

শান্তিসুধা বলেছিলেন, 'আমাদের বাড়ি সুশোভনকে কবে নিয়ে আসবেন বলুন—'

বাবা বলেছিলেন, 'যাব একদিন—'

'উঁহু, একদিন না। সামনের রোববার দুপুরে আমাদের ওখানে আপনারা খাবেন।'

'তাড়া কিসের; খাওয়া-দাওয়া পরে হবে। কিছুদিন যাক না। কখন নেমন্তন্ন করবেন আমিই আপনাকে বলে দেব।'

শান্তিসুধা কিছু একটা বুঝে নিয়েছিলেন। বলেছেন, 'ঠিক তো?'

'এক শো বার ঠিক—' বলেই বাবা পরমার দিকে ফিরেছিলেন,

'জানো পরমা, আমার এই ছেলেটার এতকাল আধুনিক আর রবীন্দ্র-সংগীত ছাড়া কিছুই ভালো লাগত না। আজ তোমার গান শোনার পর সে প্রতিজ্ঞা করেছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ছাড়া এখন থেকে অন্য কিচ্ছু শুনবে না।'

পরমা ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। তার সারা মুখে রক্তাভা ছড়িয়ে গিয়েছিল যেন। দ্রুত এক পলক সুশোভনকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে।

পাশ থেকে সুশোভন চাপা গলায় বলেছিলেন, 'বাবা, কী হচ্ছে!'

বাবা তাঁর দিকে ফিরেও তাকান নি। পরমা, অজিতেশ এবং শান্তিসুধার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে বলেছিলেন, 'এবার তা হলে অনুমতি করুন, আজকের মতো আমরা বিদায় নিই।'

বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়ার ইচ্ছা ওঁদের ছিল না। অজিতেশ বলেছিলেন, 'এক্ষুনি চলে যাবেন! ক'টা আর বাজে!'

বাবা আগেই ঘড়ি দেখে নিয়েছিলেন। বলেছেন, 'সাড়ে ন'টা। এই পর্যন্তই আমার লিমিট। এর পর বাইরে থাকা ডাক্তারের বারণ।'

শান্তিসুধা এবার বলেছিলেন, 'ডাক্তারের যখন বারণ তখন আর আটকাব না। কিন্তু সুশোভনকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ি যেতেই হবে। কথাটা মনে থাকে যেন।' সুশোভনের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'তুমি আসবে কিন্তু বাবা—' একটু আগেও একবার তাঁদের বাড়ি যাবার কথা বলেছিলেন শান্তিসুধা।

অজিতেশও দারুণ আগ্রহের গলায় বলেছিলেন, 'আসতেই হবে। না বললে শুনছি না।'

সুশোভন কি বলতে যাচ্ছিলেন সেই সময় পরমার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় শান্তিসুধা বলেছিলেন, 'সুশোভনকে তুই আমাদের বাড়ি যেতে বল্—'

পরমা কোন রকমে আরক্ত মুখ তুলে কাঁপা আধফোটা গলায় বলেছিল, 'আসবেন—' বলেই আবার চোখ নত করেছিল।

আর বিদ্যুৎচমকের মতো সুশোভনের মনে হয়েছিল বাবা এই যে

তাঁকে মিউজিক কনফারেন্সে নিয়ে এসেছেন, পরমাদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করিয়ে দিচ্ছেন—এ সবই যেন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। সুশোভন বিব্রতভাবে বাবার দিকে তাকিয়েছিলেন।

বাবার চোখে ঠোঁটে এবং চিবুকে অস্পষ্ট রহস্যময় একটা হাসি খেলা করছিল। তিনি সরল ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলেছিলেন, 'আমার দিকে তাকিয়ে কী হবে। যাবি কি যাবি না, তুই বল্—'

পরমাকে কী উত্তর দিয়েছিলেন, এতকাল বাদে সুশোভনের মনে পড়ে না।

যাই হোক বরানগরে ফেরার পথে বাবা বলেছিলেন, 'এটা আমার লাইফের ফাইনেস্ট ডিসকভারি, না কি বলিস?'

বাসে ওঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন। সুশোভন জানলার ধারে, তাঁর বাঁ পাশে বাবা। সুশোভনের চোখ দুটো ছিল জানলার বাইরে। অত রাত্তিরেও গাড়িটাড়ি বা লোকজনের ভিড় একটুও কমে নি; তবে রাস্তার ধারের দোকান-টোকান আর শো-উইণ্ডো বন্ধ হতে শুরু করেছিল। দূরমনস্কর মতো পরিচিত দৃশ্যপট দেখতে দেখতে পরমার কথাই ভাবছিলেন তিনি। আলোকোজ্জ্বল ডায়াসে রানীর মতো তার আসা, তানপুরা কোলে তুলে রাজহাঁসের মতো ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকিয়ে তার গান গাওয়া, রক্তিম লাজুক মুখে সুশোভনকে তাদের বাড়ি যেতে বলা—সব যেন কোন অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেছে। বাবার কণ্ঠস্বর কানে যেতে চমকে বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন সুশোভন। একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন্‌টা তোমার ডিসকভারি?'

বাবা বলেছিলেন, 'তুই যার কথা ভাবছিস—' তাঁর চোখ কৌতুকে চিক চিক করছিল।

ধরা পড়ে ভেতরে ভেতরে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। তবে সেটা প্রকাশ করেন নি। বাইরের দিকে তিনি যথেষ্ট স্মার্ট থাকতে চেয়েছিলেন, 'কার কথা আমি আবার ভাবছি!'

বাবার মুখে কিছুই আটকাত না। সুশোভনের কানের ভেতর মুখটা ঢুকিয়ে আস্তে করে বলেছিলেন, 'পরমার।'

ঢোঁক গিলে এবার সুশোভন বলেছিলেন, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না—' জোরে জোরে তিনি মাথা নেড়েছিলেন।

বাবা তাঁর কাঁধে সস্নেহে টোকা মারতে মারতে বলেছিলেন, 'এতে লজ্জার কিচ্ছু নেই। বী এ স্পোর্টসম্যান—'

সুশোভন আর কী বলবেন ; মুখ নীচু করে ঘামতে শুরু করেছিলেন।

বাবা রগড়ের গলায় এবং সমবয়সী বন্ধুর মতো বলেছিলেন, 'পরমার গান শুনে তার সঙ্গে আলাপ হবার পর সত্যিই যদি ওর কথা না ভাবতিস আমি বুঝতাম তুই একটা ইয়ংম্যানই না।'

সুশোভন এবারও উত্তর দেন নি ; তার মুখ নীচের দিকে আরো নেমে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাসটা এর মধ্যে শ্যামবাজারের ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং আর বাগবাজারের খালপুল পেরিয়ে বি-টি রোডে চলে এসেছিল।

এক সময় বাবাই আবার শুরু করেছিলেন, 'তুই নিশ্চয়ই ভাবছিস পরমাদের সঙ্গে আমার কি করে জানাশোনা হল ?'

ঠিক এই কথাটাই সুশোভন তখন ভাবছিলেন না। তবে পরমাদের সম্বন্ধে তাঁর দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু সে কথা তো বাবাকে বলা যায় না। উৎসুক চোখে বাবার দিকে একবার তাকিয়েই জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সুশোভন।

বাবা যা বুঝবার তাতেই বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি পরমাদের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সংক্ষেপে এই রকম। মাস দেড়েক আগে ওল্ড বালিগঞ্জে ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেছেন। ফেরার সময় পুরনো আমলের ছোট্ট ছিমছাম একটা দোতলা বাড়ির সামনে আসতেই আশ্চর্য সুরেলা গলা কানে ভেসে এসেছিল। একটি মেয়ে টোড়ি রাগের একটা গান রেওয়াজ করছে।

তখন সন্ধ্যেবেলা। বাড়িটার গেটের কাছে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন বাবা। সুরেবাঁধা এমন চমৎকার গলা কচিৎ-

কখনো তিনি শুনেছেন। রেওয়াজ শেষ হলে তিনি ভদ্রতাটদ্রতার ধার ধারেন নি। সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। মেয়েটার নাম যে পরমা তা নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না। ওরা তিন ভাইবোন। পরমাই বড়। সে লেডি ব্র্যাবোর্ণ থেকে ডিস্টিংসন নিয়ে সেবারই বি. এ. পাস করেছে। তবে পড়াশোনার চাইতে গানের দিকে তার টানটা অনেক বেশী। এর মধ্যেই এলাহাবাদ না লক্ষ্ণৌ কোথা থেকে যেন হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল মিউজিকে ডিপ্লোমা পেয়েছে। রেডিওতেও সে অডিসান দিয়ে গান গাওয়ার সুযোগ আদায় করে নিয়েছে। তবে সেখানে সে লাইট মিউজিক গেয়ে থাকে। যেমন আধুনিক বা অতুলপ্রসাদের গান। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীতের প্রোগ্রামও পায়। আর বাড়িতে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের রেওয়াজ করে থাকে।

পরমার এক ভাই বি· কম· পাস করে চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পড়ছে। আরেক ভাই সেবার সায়েন্স নিয়ে বি· এস-সি পার্ট ওয়ান দেবে। বাবা গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের একজন মাঝারি অফিসার। ওল্ড বালিগঞ্জে নিজেদের সেই পৈতৃক বাড়িটা রয়েছে। মোটামুটি উচ্চ মধ্যবিত্ত সচ্ছল পরিবারই বলা যায় তাঁদের।

আলাপ-পরিচয়ের পর পরমাদের খুব ভালো লেগে গিয়েছিল বাবার। বাবাকেও ওঁদের ভালো লেগেছে। সেদিনের পর আরো বার কয়েক বাবা পরমাদের বাড়ি গেছেন। যতবার গেছেন ততবারই বলেছেন, পরমা লাইট মিউজিক যেমন গাইছে গেয়ে যাক কিন্তু ক্লাসি-ক্যাল মিউজিকের চর্চা যেন না ছাড়ে। পরমার বাবা অজিতেশ বলেছিলেন চর্চা ছাড়বে না। তবে বাঙালী মেয়েদের পক্ষে ধ্রুপদী গান গেয়ে নাম করা খুবই কঠিন; সেই সুযোগই বা কোথায়? অবশ্য কলকাতার বড় বড় মিউজিক কনফারেন্সগুলোতে গাইতে পারলে নাম করা যায়। সেই সুবাদে ইণ্ডিয়ার নানা শহর থেকে গাওয়ার ডাক আসে। এইভাবে নামটা ছড়িয়ে যায়। কিন্তু আনকোরা নতুন

আর্টিস্টকে হুম করে কলকাতার বড় কনফারেন্সে কে সুযোগ দেবে ?

সব শুনবার পর বাবাই পরমাকে মহাজাতি সদনের মিউজিক কনফারেন্সে গান গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই যে বাবা পরমার গান শুনিয়ে এনেছিলেন তারপর বেশ কয়েকটা দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে একবারও পরমার নাম তিনি উচ্চারণ করেন নি। রোজ রাত্তিরে একসঙ্গে বসে খেতে খেতে নানা রকম গল্প করেছেন বাবা। পলিটিকস, সেক্স, লিটারেচার, স্টুডেন্টস আনরেস্ট—বিভিন্ন বিষয়ে অনর্গল কথা বলে গেছেন তিনি কিন্তু যে নামটার জন্য সুশোভন উৎসুক হয়ে থেকেছেন শুধু সেটাই বাদ। বাবার আচার-আচরণ বা চালচলন দেখে মনেই হচ্ছিল না সুশোভনের সঙ্গে আগে কখনও তিনি পরমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বা তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিতভাবে কোন কথা বলেছিলেন।

এদিকে অলৌকিক স্বপ্নের মতো সেই মেয়েটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না সুশোভন। এতদিন সংসারের দায়দায়িত্ব ছাড়া অন্য কোনদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম বা তৃপ্তির কথা ভাবার মতো সময়ও তিনি পান নি। কিন্তু পরমাকে দেখার পর থেকে নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক অস্থিরতা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। মেয়েটা দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে যেন ক্রমাগত তার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পরমাকে আরেক বার দেখবার জন্য তিনি ভেতরে ভেতরে দমবন্ধ মানুষের মতো ছটফট করে যাচ্ছিলেন। বাবার আচরণ যতই বন্ধুর মতো হোক, সমস্ত ব্যাপারটাকে যতই স্পোর্টসম্যানের মতো তিনি নিন না, তাঁকে পরমার কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তখন এক কাণ্ড করতেন সুশোভন। সেটা ছিল জলসার মরশুম। কলকাতার এ-পাড়ায়, সে-পাড়ায়, কলামন্দিরে, রবীন্দ্রসদনে, বড় বড় পার্কে তখন রোজ লাইট আর ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কনফারেন্স বসছে। আর সেই কনফারেন্সের নিয়মিত

বিজ্ঞাপন বেরুত খবর-কাগজে। সকাল হলেই সুশোভন খবর-কাগজ হাঁটকে সেই সব বিজ্ঞাপন বার করতেন আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন আর্টিস্টদের তালিকায় পরমার নামটা আছে কিনা। তাঁর ইচ্ছা যে কনফারেন্সে সে গাইবে টিকিট কেটে সেখানে যাবেন। কিন্তু যেতে গিয়েই তাঁর মনে হয়েছে কনফারেন্সে যদি বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দেখা হলে বাবা ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিশ্চয়ই নেবেন, মজা করে তু-একটা রগড়ের কথাও বলবেন, কিন্তু সুশোভন তাঁর দিকে তাকাতে পারবেন না। লজ্জায় তাঁর মাথাটি স্রেফ কাটা যাবে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা বাবা সোজা তাঁর ঘরে এসে বলেছিলেন, 'পাবু, আজ সন্ধ্যেবেলা অফিস ছুটির পর কী করছিস?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'কোন প্রোগ্রাম নেই; বাড়ি চলে আসব।'

বাবা বলেছিলেন, 'বাড়ি ফিরতে হবে না। এণ্টালিতে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একটা কনফারেন্স হচ্ছে। আমার কার্ডটা দিচ্ছি; তুই সেখানে চলে যাস। না হলে শুধু শুধু কার্ডটা নষ্ট হবে।'

সুশোভনের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উলটোপালটা স্রোত বয়ে গিয়েছিল। কেননা সেদিনকার খবর-কাগজে এণ্টালির কনফারেন্স-টার বিজ্ঞাপন ছিল আর ছিল আর্টিস্টদের তালিকায় পরমার নাম। প্রায় শ্বাসরুদ্ধের মতো সুশোভন বলেছিলেন, 'তুমি যাবে না?'

'শরীরটা ভীষণ ম্যাজ ম্যাজ করছে; কেমন যেন ফিভারিশ লাগছে। আজ আর বাড়ি থেকে বেরুব না।'

সুশোভনের মনে আছে কার্ডটা নিয়ে এণ্টালির কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে মায়া-কাননের পরীর মতো গান গেয়েছিল পরমা। সামনের সারির একটা চেয়ারে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন সুশোভন। গান শেষ হবার পর অজস্র হাততালি আর অভিনন্দনের মধ্যে ডায়াস থেকে চলে গিয়েছিল পরমা। আর সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সুশোভন। তারপর পরমার সঙ্গে

দেখা করার জন্য কখন যে ব্যাক স্টেজের কাছে চলে এসেছিলেন, মনে নেই।

কনফারেন্সের কর্মকর্তারা ভেতরে যেতে দেবেন না; সুশোভন যাবেনই। পরমার সঙ্গে তার আলাপ আছে, এই কথাটা অনেকবার বলে এবং প্রচুর ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত ভেতরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তবে কর্মকর্তাদের একজন সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন—খুব সম্ভব পরমার সঙ্গে সত্যি সত্যিই আলাপটা আছে কিনা তাই দেখতে।

ব্যাক স্টেজে ভিড় ছিল না। কারণ উদ্যোক্তারা অভিনন্দন জানাবার জন্য কারোকেই ভেতরে ঢুকতে দেন নি। পরমা ছাড়া সেখানে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের দু-চারজন আর্টিস্ট বসে গল্প-টল্প করছিলেন। তখনও তাঁরা মঞ্চে গিয়ে গান বা নাচ পরিবেশন করেন নি। তাঁদের প্রোগ্রাম ছিল বেশী রাত্তিরে।

যাই হোক সেদিন বাবা সঙ্গে না থাকাতে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন সুশোভন। অবশ্য পরমার সঙ্গে একা দেখা করতে যাওয়ার সংকোচটা ভেতরে ভেতরে ছিলই। সুশোভন বলেছিলেন, 'নমস্কার, চিনতে পারছেন?'

স্নিগ্ধ হেসে দুই হাত জোড় করে বুক পর্যন্ত তুলেছিল পরমা। তার মুখে আগের দিনের মতোই রক্তাভা ছড়িয়ে গিয়েছিল। তবে আগের দিনের চাইতে সেদিন তাকে অনেক বেশী সাবলীল মনে হয়েছে। আস্তে মাথা নেড়ে পরমা বলেছিল, 'কি আশ্চর্য, চিনতে পারব না কেন? এক মাস আগে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাকে এর মধ্যেই ভুলে যাব; আমার স্মৃতিশক্তি কি এতই খারাপ?'

সুশোভন হেসে হেসে একটু মজা করেই এবার বলেছিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল। আপনি চিনতে না পারলে আমার হাড়গুলো এখানে ডিপোজিট রেখে যেতে হত।' বলে চোখের কোণ দিয়ে কনফারেন্সের সেই কর্মকর্তাটিকে লক্ষ্য করেছিলেন।

একটু উদ্বিগ্ন হয়েই পরমা জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন?'

'আমাকে এখানে আসতে দিচ্ছিল না। 'আপনি আমাকে চেনেন'

বলতে তবে ঢুকতে পেরেছি। না চিনলে আমার অবস্থাটা কী হত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

পরমা হেসে ফেলেছিল।

সেই কর্মকর্তাটির যা জানবার জানা হয়ে গেছে। তিনি আর দাঁড়ান নি ; ব্যাক স্টেজ থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গিয়েছিলেন।

পরমা এবার বলেছিল, 'আমার প্রোগ্রাম শুনেছেন ?'

সুশোভন খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনার প্রোগ্রাম শুনবার জন্যই তো কনফারেন্সে এসেছি।'

'কি রকম লাগল বললেন না তো ?'

'সিম্প্‌লি ওয়াণ্ডারফুল। অডিয়েন্স চার্মড হয়ে গেছে।'

সারা মুখে খুশী ছড়িয়ে গভীর গলায় পরমা বলেছিল, 'ধন্যবাদ।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'আপনি একা ; কাকাবাবু আসেন নি ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'বাবার শরীরটা ভালো না ; জ্বর জ্বর মতো হয়েছে। তাই আসতে পারেন নি।'

'ও।'

এরপর কী বলবেন সুশোভন ভেবে পান নি। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না প্লীজ।'

'না-না, বিরক্ত কিসের—' পরমা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল।

পরমার কাছে বসে কিছুক্ষণ গল্প করার দারুণ একটা ইচ্ছা হয়েছিল সুশোভনের। কিন্তু কী গল্প করবেন ? বেশিক্ষণ থাকলে পরমাই বা কী ভাববে ? ব্যাপারটা তার কাছে নিশ্চয়ই শোভন মনে হবে না। সুশোভন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

'এক্ষুনি যাবেন ! মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না ?'

সম্মোহিতের মতো সুশোভন যখন পরমার সঙ্গে দেখা করতে ব্যাক স্টেজে চলে এসেছিলেন তখন অজিতেশ বা শান্তিসুধার কথা তাঁর মাথায় ছিল না। ওঁরা যে রাত্তিরে একা একা মেয়েকে কনফারেন্সে প্রোগ্রাম করতে পাঠাবেন না, এটা তিনি একবারও ভাবেন নি।

পরমা তাঁদের কথা বলতে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। বাবাকে ছাড়াই তিনি একা পরমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এটা অজিতেশ এবং শান্তিসুধা কিভাবে নেবেন তা বোঝা যাচ্ছিল না। ব্যস্তভাবে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আজ থাক; আমার অন্য একটা কাজ আছে। পরে ওঁদের সঙ্গে দেখা করব।' একরকম দৌড়েই ব্যাক স্টেজ থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ি ফিরে বাবার মুখোমুখি বসে খেতে খেতে অন্যদিনের মতো সেদিনও নানা রকম গল্প হয়েছে—সেক্স, পলিটিক্স, স্পোর্টস্ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেদিনকার যেটা সব চাইতে ইমপর্টাণ্ট ব্যাপার অর্থাৎ এণ্টালির সেই মিউজিক কনফারেন্সটা সম্পর্কে একটা কথাও হয় নি। সুশোভনের ইচ্ছা হয়েছে পরমার প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামের পর মুগ্ধ শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের কথা অনেকক্ষণ ধরে বলবে। বাবা জানতেন পরমা সেদিন কনফারেন্সে গিয়েছে। অথচ এ বিষয়ে তিনি যদি এতটুকু আগ্রহ বা কৌতূহল না দেখান সুশোভন বলেন কি করে? গায়ে পড়ে বলতে গেলে বাবা স্পোর্টস্ম্যানের মতো হয়ত শুনবেন কিন্তু শুনবার পর এমন সব ঠাট্টাটাট্টা আর রগড় করবেন যাতে সুশোভনের কানের ডগা লজ্জায় গরম হয়ে উঠবে। কাজেই বলার ইচ্ছা থাকলেও তাঁকে মুখ বুজে থাকতে হয়েছে।

মনে পড়ে, এরপর আরো চারটে কনফারেন্সে শরীর খারাপের অজুহাতে বাবা গান শুনতে যান নি। নিজের কার্ড দিয়ে সুশোভনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই চারটে কনফারেন্সেও পরমার প্রোগ্রাম ছিল। তার গান হয়ে যাবার পর মুগ্ধ পতঙ্গের মতো সুশোভন ব্যাক স্টেজে চলে গেছেন; আর প্রত্যেক বারই লক্ষ্য করেছেন সেখানে অজিতেশ বা শান্তিসুধা কেউ নেই। পরমাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, 'বাবা-মা এই তো এখানেই ছিলেন; কোথায় যে গেলেন—'

বার বার দেখা হওয়ার ফলে সুশোভন আর পরমার সংকোচ কেটে গিয়েছিল, দুজনে বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যাক স্টেজে বসে কতটুকু কথা আর বলা যায়! ভিড়টিড়

না থাকলেও অন্য আর্টিস্ট বা কনফারেন্সের অর্গানাইজারদের কেউ না কেউ সেখানে থাকতেনই। হাটের মাঝখানে সবার কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করে চলে আসতেন সুশোভন। অথচ তাঁর ইচ্ছা করত সারা রাত পরমার পাশে বসে কথা বলে যান। ভাবতেন মিউজিক কনফারেন্সের ব্যাক স্টেজে নয়, বাইরে অন্য কোথাও পরমার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু সে কথাটা বলতে ভীষণ লজ্জা লাগত।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন সুশোভন, কনফারেন্স থেকে তিনি ফিরে এলে বাবা কিন্তু সে বিষয়ে একটা কথাও জিজ্ঞেস করতেন না; বিন্দুমাত্র কৌতূহলও দেখাতেন না। গান-বাজনা সম্পর্কে তিনি হঠাৎ যেন অত্যন্ত উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন।

এই ভাবেই চলছিল। পর পর চারটে কনফারেন্স পর্যন্ত বাবা একেবারে চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু পঞ্চম কনফারেন্সের পর সুশোভনকে তিনি দারুণ একটা চমক দিলেন।

পাঁচ নম্বর কনফারেন্সটা বসেছিল সাউথ ক্যালকাটায়—লেক ময়দানের কাছে। সেখান থেকে ফেরার পর বাবা আচমকা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'প্রগ্রেসটা কি রকম হল? তুই গ্রীন সিগন্যাল দিলে আমি এবার প্রসীড করতে পারি।'

বাবা কী বলতে চেয়েছেন, সুশোভন বুঝতে পারেন নি। বিমূঢ়ের মতো তিনি বলেছিলেন, 'মানে—'

'আমি জানতে চাইছি পরমার সঙ্গে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা ঠিক হয়ে গেছে তো?' বাবার চোখে-ঠোঁটে-চিবুকে কৌতুক যেন জোনাকির মতো নেচে বেড়াচ্ছিল।

সুশোভন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'তুমি কী বলছ বাবা! আমি ঠিক—'

বাবা মজার গলায় বলেছিলেন, 'পাঁচটা কনফারেন্সে আমি না গিয়ে তোকে পাঠালাম। পাঁচবার তুই ব্যাক স্টেজে গিয়ে পরমার সঙ্গে দেখা করলি। ওর মা-বাবাও সে সময়টা ওখানে থাকতেন না। একটা মেয়েকে বুঝবার পক্ষে পাঁচটা ইণ্টারভিউ কি যথেষ্ট নয়?'

সুশোভনের শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা বয়ে গিয়েছিল। বাবা নিজে কনফারেন্সে না গিয়ে বার বার যে তাঁকে পাঠিয়েছেন কিংবা পরমার প্রোগ্রামের পর অজিতেশ শান্তিসুধা যে ব্যাক স্টেজে থাকতেন না—কে জানতো এ সমস্তই ষড়যন্ত্র? কে জানতো এইভাবেই ওঁরা তাঁকে আর পরমাকে দেখা করাব এবং পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন?

একটা কথা ভেবে দারুণ লজ্জা পেয়েছিলেন সুশোভন। প্রোগ্রামের পর তিনি যে ব্যাক স্টেজে গিয়ে পরমার সঙ্গে দেখা করবেনই—তাঁর এই গোপন দুর্বলতা আগে থেকেই বাবা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। খড়ি পেতে কারা যেন ভূ-ভারতের কথা জেনে ফেলে, বাবা বোধহয় তাদেরই একজন।

দুর্বলতাটা ধরা পড়ে যেতে বাবার দিকে আর তাকাতে পারছিলেন না সুশোভন। ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে ছিলেন; তাঁর মুখে শরীরের সব রক্তোচ্ছ্বাস উঠে এসেছিল যেন।

বাবা এবার অন্তর্যামীর মতো বলেছিলেন, 'লজ্জা পাবার কিচ্ছু নেই; ইট্‌স কোয়াইট ন্যাচারাল। তুই যদি পরমার সঙ্গে দেখা না করতিস, তোকে অ্যাবনর্মাল ভাবতাম। যাক গে, এবার তা হলে অজিতেশবাবুর কাছে প্রস্তাব দিয়ে ফেলি—না কি বলিস?'

সুশোভন উত্তর দ্যান নি। তবে বাবা যা বুঝবার বুঝে নিয়েছিলেন। এর এক মাসের মধ্যেই সুশোভনের সঙ্গে পরমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

সুশোভনের মনে পড়ে বিয়ের ব্যাপারে পাঁচদিন ছুটি নিয়েছিলেন। বৌভাত-টৌভাত মিটে যাবার পর অফিসে এসে বসতে না বসতেই ফোন বেজে উঠেছিল। টেলিফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই লাইনের ওপার থেকে একটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল, 'কনগ্র্যাচুলেসনস স্যার—'

গলাটা প্রথমে চিনতে পারেন নি সুশোভন। বলেছিলেন, 'কী জন্যে?'

'শুভ বিবাহের জন্যে। আমার হয়ে আপনার গায়িকা স্ত্রীকেও অভিনন্দন জানিয়ে দেবেন। আপনাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু ক্ষমা করবেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।'

'চিনতে পারছেন না! আমার লাকটাই দেখছি খারাপ। অধমের নাম মানেকলাল মেহতা।'

সুশোভন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছিল লোকটা তাঁর ওপর সমানে লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। বিস্ময় কাটলে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

মানেকলাল বলেছিল, 'আছে স্যার, আছে। আপনার বিয়েতে এত লোকের নেমন্তন্ন হল; আমিই শুধু বাদ থেকে গেলাম।'

'এই কথা?'

'না-না, লাইনটা দয়া করে কাটবেন না। বিশেষ দরকারী একটা কথা বলব।'

'দু মিনিট সময় দিচ্ছি। যা বলবার তার মধ্যেই বলতে হবে। নষ্ট করার মতো বাজে সময় আমার নেই।'

মানেকলাল বলেছিল, 'দু' মিনিটই সাফিসিয়েন্ট। আপনি স্যার বিয়ে করলেন; রেসপনসিবিলিটি আরো বাড়ল। আমার সেই প্রস্তাবটা আশা করি এবার বিবেচনা করবেন। তিন লাখ টাকার সেই স্ট্যাণ্ডিং অফারটা এখনও রয়েছে। ওটা চিরকাল স্ট্যাণ্ডিংই থেকে যাবে। মাঝে মাঝে ফোন করে ব্যাপারটা আপনাকে মনে করিয়ে দেব।'

ঝড়াং করে লাইনটা কেটে দিয়েছিলেন সুশোভন।

এদিকে পরমাকে পেয়ে বাবা কী যে করবেন, ঠিক করতে পারছিলেন না। বড় বড় মিউজিক কনফারেন্সে তাকে ক্লাসিক্যাল গানের প্রোগ্রাম তো পাইয়ে দিচ্ছিলেনই, তা ছাড়া রেকর্ড কোম্পানি আর সিনেমার লোকদের কাছে গিয়ে লাইট মিউজিক গাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই সিনেমায় পরমার প্লে-ব্যাক শোনা গিয়েছিল; নাম-করা একটা রেকর্ড কোম্পানি তার

আধুনিক গানের ত্বখানা ডিস্ক বাজারে ছেড়েছিল। ডিস্কগুলো বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেছে; চোখের পলকে পৃথিবী জয় করে নিয়েছিল পরমা।

এর পর চার-পাঁচটা বছর স্থখের স্রোত হয়ে বয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে অগুনতি রেকর্ড বেরিয়েছে পরমার; কম করে তিরিশ-চল্লিশটা ফিল্মে সে প্লে-ব্যাক করেছে। তা ছাড়া ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কনফারেন্সে কতবার সে গেয়েছে তার হিসেব নেই। পরমা ছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গলে, বিশেষ করে কলকাতায় গানের কথা তখন ভাবা যায় না। মিউজিকের জগতের সে তখন গ্ল্যামার গার্ল।

এত নাম, এত ব্যস্ততা, তবু সংসারের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির দিকে নজর ছিল পরমার। কে কী খেতে ভালবাসে, বাবার কখন কখন ওষুধ খাবার সময়, স্বল্পভাষিণী মা'র কিসে আনন্দ—সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল সে। নিজের রেকর্ডিং রিহার্সাল এবং রেওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সকলের হাতের কাছে তাদের বাঞ্ছিত স্থখটিকে তুলে ধরত পরমা। প্রগাঢ় মমতায় আর ভালবাসায় তাঁদের সংসারটাকে জয় করে নিয়েছিল পরমা। বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ—বাবা, সমরেশ, অমরেশ, দিবাকর, সবাই যেন পরমার ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিল। এমন কি যে মা দারুণ চাপা ধরনের মেয়ে, অত্যন্ত অল্প কথা বলতেন, তাঁকেও দেখা যেত প্রচুর হেসে হেসে পরমার সঙ্গে গল্প করছেন। যার যা কিছু কথা বা গোপন পরামর্শ—পরমাকে না হলে চলত না।

স্থশোভন মাঝে মাঝেই মুখটা করুণ করে বলতেন, 'সবার দিকেই তোমার নজর। শুধু এই বাজে লোকটার কথাই মনে থাকে না।' বলে বুকে আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে দিতেন।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত পরমা। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চোখ কুঁচকে অল্প অল্প হাসত। হাসিটা চারদিকে ছড়িয়ে যেত না; ভোরের নরম আলোর মতো তার ঠোঁটে আর চোখে জড়িয়ে থাকত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা এক কাণ্ডই করে বসত সে। ত্ব হাতে চুল ধরে স্থশোভনের মুখটা নিজের মুখের কাছে

টেনে আনত। তারপর গভীর আবেগে তার নাকে নাক ঘষতে থাকত আর বলত, 'হিংসুক, হিংসুক। হিংসুক কোথাকার—'সুশোভনের প্রতি এটাই ছিল তার গাঢ় ভালবাসার প্রকাশ।

মনে আছে সেই চার-পাঁচটা বছরে তাঁদের সংসারে কয়েকটা ছোট-বড় ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে বুবুন হয়েছে। সেজ ভাই সমরেশ ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে একটা বিরাট বৃটিশ কম্পানিতে চাকরি যোগাড় করেছে। ছোট ভাই দিবাকরও একই বছরে এম. এ. আর ডব্লিউ. বি সি. এস. পাশ করে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে ভালো চাকরি পেয়েছে। আরো একটা ব্যাপার ঘটেছিল এই ক'বছরে ; অমরেশ আর সমরেশের একই দিনে বিয়ে হয়েছিল। সুশোভন অমরেশের জন্য গরিবের ঘর থেকে সুধাকে নিয়ে এসেছিলেন। তবে সমরেশের জন্য মেয়ে পছন্দ করেছিলেন বাবা। অভিজাত এবং বনেদী বড় ঘরের মেয়ে মাধুরী ; সমরেশের স্ত্রী হয়ে সে এ বাড়িতে এসেছিল।

সুশোভনদের সংসারে সুধার বউ হয়ে আসাটা রীতিমত নাটকীয়। ভাবলে এখনও অদ্ভুত লাগে, আবার আনন্দে মন ভরেও যায়। একদিন দুপুরে অফিসে বসে ফাইলে মুখ ডুবিয়ে রেখেছেন সুশোভন. আচমকা টেবিলের ওধার থেকে আবছা ভীতু গলায় কেউ ডেকে উঠেছিল, 'একটু শুনবেন—'

চমকে মুখ তুলতেই সুশোভন দেখতে পেয়েছিলেন, ঢ্যাঙা মধ্যবয়সী একটা লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাঙাচোরা মুখ তার, চোখ গর্তে ঢোকানো, গালে আলপিনের মতো কাঁচাপাকা দাড়ি। সারা গায়ে মাংস বলতে কিচ্ছু নেই, চামড়ার তলা থেকে গজালের মতো হাড় বেরিয়ে রয়েছে। পরনে খাটো ময়লা ধুতি আর সেলাই-করা হাফ শার্ট, চোখে ডাঁটিভাঙা সুতো বাঁধা গোল চশমা।

সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী চাই ?'

গাঁট পাকানো হাত দুটো জোড় করে মুখচোখ যতটা সম্ভব করুণ করে লোকটা বলেছিল, 'মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না ; আমাকে কিছু সাহায্য করুন।'

বাপ মরেছে, ছেলের ওষুধ কিনতে হবে—এমনি নানা রকম ধাপ্পা দিয়ে অনেক লোক কৌশলে পয়সা আদায় করে থাকে। এই সব ধড়িবাজ জোচ্চোরেরা মানুষের সবরকম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকে। সুশোভন সেই লোকটাকে তাদেরই মতো একজন ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, 'মেয়ের বিয়ের নাম করে টাকা আদায়ের ধান্দা!'

লোকটা কাচুমাচু মুখে বলেছিল, 'আজ্ঞে না; সত্যি সত্যি মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। নিজের জন্য আমার কিচ্ছু দরকার নেই। দয়া করে কিছু ভিক্ষে দিন; কন্যাদায় থেকে আমাকে মুক্ত করুন।'

হঠাৎ সুশোভনের কি যেন হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'সত্যিই আপনার মেয়ে আছে কিনা, আমি দেখতে চাই। যদি না থাকে আপনি কিন্তু ভীষণ ঝামেলায় পড়ে যাবেন।' ঝোঁকের মাথায় লোকটার কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন তিনি।

লোকটা বলেছিল, 'আপনি অনুমতি করলে মেয়েকে নিয়ে আসব।'

'না। আমিই আপনার সঙ্গে যাব।'

'কবে যাবেন বলুন—'

'আজই। আপনি অপেক্ষা করুন; ছুটির পর যাব।'

ছুটির পর সত্যি সত্যিই লোকটার সঙ্গে চেতলার একটা বস্তি মতো বাড়িতে গিয়েছিলেন সুশোভন এবং সেখানেই সুধাকে দেখেছিলেন। সেই লোকটা মানে পশুপতি গাঙ্গুলির মেয়ে সুধা। তাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেন নি সুশোভন। সুধার সঙ্গে ঘণ্টা-খানেক কথা বলে ওখানে বসেই পশুপতিকে কথা দিয়েছিলেন নিজের ভাইয়ের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবেন। পশুপতির কথার সত্যমিথ্যা যাচাই করতে এসে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। যাই হোক এ বিয়ের যাবতীয় খরচ সুশোভনই দিয়েছিলেন।

মনে আছে নতুন দুই বউ বাড়ি আসার পর বাবা তাদের নিয়ে সুশোভনের কাছে এসেছিলেন। সুশোভনকে দেখিয়ে সুধা আর মাধুরীকে বলেছিলেন, 'আজ যে তোমরা অনেক মর্যাদা নিয়ে এ বাড়িতে

আসতে পেরেছ তা এর জন্যে। আমি নামে মাত্র হেড অফ দি ফ্যামিলি কিন্তু এ-ই সব। একে চিরদিন সম্মান করবে। আশা করি আমার এই কথাটা তোমাদের মনে থাকবে।’

সুধা এ বাড়িতে আসার পর থেকেই সুশোভনের খাওয়া-দাওয়া সুখ-আরাম, সব কিছুর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। তার কথাবার্তা আচার-আচরণ সব কিছুই ছিল আদুরে বোনের মতো। সুশোভন অফিসে যাবেন, দৌড়ে ভাত নিয়ে আসত সুধা। কাছে বসে থেকে খাওয়াতো। একটুও কম খাবার উপায় ছিল না; তা হলেই রাগ কিংবা অভিমান করত। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এসে সুশোভন দেখতেন পান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুধা। পানটা দিয়েই স্যুট-ট্যুট হাতের কাছে রেখে জুতো মুছে ঠিক করে রাখত। অফিস থেকে ফিরলেই জলখাবার বানাতে বসে যেত সুধা। মোট কথা সুশোভনের দিকে হাজারটা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত সে।

পরমাকেও দারুণ ভালবাসত সুধা। পরমা যদি সুশোভনের কোন কাজটাজ করে দেবার জন্য আসত, সে বলত, ‘তুমি রেওয়াজ করতে যাও দিদি; তোমার না কাল প্লে-ব্যাক আছে। দাদার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।’

পরমা হেসে হেসে বলত, ‘তুই আসাতে আমি বেঁচে গেছি।’

চেতলার সেই বস্তিতে বসে সুধা ভাবতেও পারে নি, কোনদিন এরকম একটা সংসারে আসতে পারবে। সুশোভন যেন একটা অন্ধকার পাতাল থেকে তাকে হাত ধরে মায়াকাননে নিয়ে এসেছে। সুশোভনের কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না।

মাধুরীও সুশোভনকে সম্মান করত। এমনিতে সে খুবই ভাল; ব্যবহার-ট্যবহার চমৎকার। তবে সে যে পয়সাওলা বড় ঘরের মেয়ে সেটা কখনও-সখনও প্রকাশ হয়ে পড়ত। পরমা বা সুশোভনকে কোনদিন সে অসম্মান করে নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সুধার সম্বন্ধে তার যে মনোভাবটা ছিল তার নাম অবজ্ঞা। সুধারা যে গরীব, বস্তি থেকে উঠে এসে সে যে তার সঙ্গে সমান মর্যাদা দখল করে বসেছে,

হয়ত এই ব্যাপারটা মাধুরীকে উত্তেজিত করে তুলত। সুধাকে কষ্ট দেবার জন্য মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে বসত সে। সুশোভনরা সবাই মিলে গল্প-টল্প করছেন, হুম করে মাধুরী একটা দামী শাড়ি কি ঘড়ি এনে বলত, 'জানেন দাদা, আমার বাবা আজ এটা পাঠিয়েছেন।' প্রায়ই এই কাণ্ডটা করত সে।

এটা অবশ্য ঠিক, মাধুরীর বাপের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই কিছু না কিছু আসত; পরমার বাবাও তাঁর মেয়ের জন্য নানা উপলক্ষে শাড়ি-টাড়ি পাঠাতেন।

পাছে সুধা দুঃখ পায় সেজন্য বাপের বাড়ি থেকে কিছু এলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা লুকিয়ে ফেলত পরমা। কিন্তু মাধুরী করত কি দামী উপহারটা এনে সুধার সামনে সবাইকে বেশ গর্ব করে দেখাত। তার মধ্যে এক ধরনের স্যাডিজম ছিল: সুধাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতে সে ভালবাসত।

সুশোভন লক্ষ্য করতেন মাধুরীর হাতের সেই শাড়ি বা ঘড়িটড়ি দেখতে দেখতে সুধার মুখটা মলিন হয়ে উঠেছে। মাধুরীকে সুশোভন বলতেন, 'খুব সুন্দর জিনিস।' বলেই উঠে পড়তেন। তারপর দামী কিছু কিনে সোজা চলে যেতেন চেতলায়। পশুপতিকে সেটা দিয়ে বলতেন, 'আজই এটা সুধাকে দিয়ে আসবেন। আমি সে কিনে দিয়েছি সেটা বলবেন না।'

এইভাবেই চলছিল।

মনে পড়ে অমরেশ সমরেশের বিয়ের সাত-আট মাস পর সুশোভন একদিন অফিস থেকে সবে ফিরে এসেছেন; পরমা কাছে বসে হেসে হেসে বলেছিল, 'বাড়িতে আরেকবার সানাই বসাবার ব্যবস্থা কর।'

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সুশোভন বলেছিলেন, 'মানে!'

'দুপুরে আকাশবাণী ভবনে গিয়েছিলাম; একটা গানের রেকর্ডিং ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য ট্যাক্সি খুঁজছি, হঠাৎ দেখি রাজভবনের ওদিকটায় তোমার ছোট ভাই শ্রীমান দিবাকর একটি মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প করতে করতে চলেছে।'

'গল্প করলেই সানাই বাজাতে হবে ?'

'উঁহু—' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল পরমা। বলেছিল, 'কিন্তু তোমার ভ্রাতাটিকে যেরকম গদগদ দেখলাম তাতে সানাইটা না বাজালেই চলবে না।'

সেইদিনই আরো কিছুক্ষণ বাদে অমরেশ তার অফিস থেকে ফিরে একই কথা বলেছিল। সেও ওই মেয়েটির সঙ্গে একদিন না, বেশ কয়েকদিন এসপ্ল্যানেডে, ময়দানে কি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে দিবাকরকে বেড়াতে দেখেছে।

অতএব রাত্রিবেলা দিবাকর ফিরে এলে তিন বৌ—পরমা মাধুরী এবং সুধাকে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। ব্যাপারটা কতখানি ঘোরালো হয়েছে সেটা জানাই ছিল উদ্দেশ্য। ওরা তিনজন ঝানু গোয়েন্দার মতো জেরা করে করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসল খবরটা নিয়ে ফিরে এসেছিল। ব্যাপারটা খুবই গভীর। যে মেয়েটার সঙ্গে দিবাকর ঘুরে বেড়ায় তার নাম অমিতা। তার বাবা একজন প্রাক্তন ডেপুটি মিনিস্টার। মন্ত্রিত্ব যাবার পর তখন তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছেন। কলকাতায় তুখানা বাড়ি আছে, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স মোটামুটি ভালই। অমিতা ছাড়া আরো একটি মেয়ে রয়েছে ; সে তখন বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। আর অমিতা সে বছরই হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছে। এক্স ডেপুটি মিনিস্টারের যা কিছু আছে তুই বোন ভাগাভাগি করে পাবে। তাতে একেক জনের অংশে একটা করে বাড়ি আর কম করে লাখখানেক টাকা পড়বে। এ ছাড়া আরো একটা খবর পরমারা এনেছিল। অমিতারা কায়স্থ ; তাদের গোত্র বাসুকা। অমিতার সঙ্গে বিয়েটা না হলে দিবাকব চিরকুমার থাকবে।

খবরটা পাবার পর বাবাকে চেয়ারম্যান করে একটা পারিবারিক সভা বসানো হয়েছিল। মনে আছে সব শুনবার পর অমিতারা ব্রাহ্মণ নয় জেনে মা আপত্তি করেছিলেন ; কেননা তাঁদের পরিবারে অসবর্ণ বিয়ে আগে আর কখনও হয় নি। সুশোভন মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আজকাল জাত-টাত কেউ

মানে না। সব বাড়িতেই এরকম বিয়ে হচ্ছে। যে ফ্যামিলির সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি সেটা যখন ভাল তখন আর তুমি অমত কোরো না মা।'

বাবার এ বিষয়ে কোনরকম আপত্তি ছিল না। সব ব্যাপারেই তাঁর মতামত অত্যন্ত উদার আর ঋজু। পুরনো ভ্যালুগুলো সম্বন্ধে বরাবরই বাবার অসীম শ্রদ্ধা ছিল ; তাই বলে কোন রকম বাজে সংস্কারকে তিনি আমল দিতেন না। তবে হেসে হেসে বলেছিলেন, 'দিবুটা কি রকম ক্যালকুলেটিভ দেখেছিস ! খুজে খুঁজে এমন একটা মেয়ে বার করেছে যাকে বিয়ে করলে প্রপার্টি পাবে, মোটা ক্যাশ পাবে। ফাইন !' কোন কিছু উদ্দেশ্য করে তিনি কথাগুলো বলেন নি। নেহাত মজা করার জন্যই বলা।

পরের দিনই সুশোভন অমিতাদের পাম-অ্যাভেনিউর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

অমিতার বাবা মানুষটি চমৎকার। সুশোভন কী উদ্দেশ্যে এসেছেন জেনে খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তাঁদের পরিবার এবং দিবাকর সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। সুশোভনের উত্তর শুনে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম হ্যাপি। আপনারা বিয়ের ঠিক করুন ; আমি প্রস্তুত।'

এরপর বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন ভদ্রলোক, নানা বিষয়ের মধ্যে তাঁর মন্ত্রিত্বের গল্পই অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। মোট আট মাস তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উপমন্ত্রী ছিলেন। তখন বন-মহোৎসব চলছে। সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জেলায় জেলায় ঘুরে তিনি মোট দু'হাজার গাছের চারা পুঁতেছেন ; মন্ত্রী থাকাকালীন সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। এত কম সময়ে দু'হাজার গাছ পোঁতা নাকি একটা রেকর্ড। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিতার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে আসার পনের দিনের মধ্যেই দিবাকরের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বাবা যত অমায়িক আর সাদাসিধে হোন না, এক্স ডেপুটি মিনিস্টারের মেয়ে অমিতার ছিল ভয়ানক গর্ব। বাবা মন্ত্রী থাকা-

সময় তাঁর সঙ্গে কোথায় কোথায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে, লোকে তাদের কি রকম খাতির-টাতির করত, কোন্ কোন্ নাম-করা লোক তাদের বাড়ি আসত, রাজভবনে বড় বড় পার্টিতে অনবরত তাদের যে ইনভিটেসন থাকত—পরমা সুধা আর মাধুরীকে ডেকে ডেকে দিনরাত এই সব গল্প করত। কোন কোন দিন সে বলত, 'আচ্ছা বড়দি মেজদি সেজদি—তোমরা কখনও প্লেনে উঠেছ?'

পরমা তার কথায় মজা পেত। বলত, 'না ভাই, উঠি নি।' সুধার মুখ ম্লান হয়ে যেত। সে উত্তর দিত না। তবে মাধুরী ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিত না; মুখ কালো করে সে বলত, 'উঠবার সুযোগ পাই নি। তাই বলে জীবনটা কি ব্যর্থ হয়ে গেছে?'

অমিতা কী বুঝত কে জানে। সে বলত, 'গেছেই তো। প্লেনে চড় নি, পার্টিতে যাও নি, বড় বড় লোকের সঙ্গে মেশো নি। এ সব না করলে লাইফে চার্ম কোথায়?'

মাধুরী বলত, 'কি করব বল ভাই; আমার বাবা তোমার বাবার মতো মিনিস্টার নন।'

এই নিয়ে একেকদিন মাধুরীর সঙ্গে অমিতার ঝগড়া-টগড়াও হয়ে যেত। অমিতা আসার পর একটা ভালো ব্যাপার হয়েছিল, মাধুরী আর বাপের বাড়ির শাড়িটাড়ি দেখিয়ে সুধাকে আঘাত করত না। কারণ এর মধ্যে এই সংসারে এমন একজন এসে গেছে যার বাপের বাড়ির জোর মাধুরীর বাপের বাড়ির চাইতে অনেক বেশী। শাড়ি বা অন্য উপহার-টুপহার বার করতে গেলে অমিতা হয়ত তার বাবার প্রসঙ্গ টেনে এমন কিছু করে বসবে যাতে মাধুরীর কোন কিছু বলার থাকবে না; উল্টে লজ্জায় আর অপমানে মাথা নীচু হয়ে যাবে।

একেকদিন অমিতার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া বেশী হলে মাধুরী সুধাকে টানতে টানতে সুশোভনের কাছে নিয়ে যেত। বলত, 'অমিতা ওর বাবার কথা বলে সব সময় আমাদের অপমান করে; মেজদিকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আপনাকে এর বিচার করতেই হবে।

অমিতা আসায় আরও একটা লাভ হয়েছিল, মাধুরী যেচে সুধার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল।

যাই হোক মাধুরীর কাছে সব জেনে নিয়ে সুশোভন হাসতে হাসতে বলতেন, 'অমিতাটা একটা ছেলেমানুষ। ওর কথায় তোমরা কান দিও না।'

এইভাবেই জীবন নানা রঙের সুতো দিয়ে তার প্যাটার্ন বুনে যাচ্ছিল।

দিবাকরের বিয়ের কত দিন বাদে, চার মাস না পাঁচ মাস, ঠিক মনে নেই ; সুশোভনদের সংসারে পর পর দুটো বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

প্রথমটা বাবাকে নিয়ে। আগের স্ট্রোকের দশ-বারো বছর পর এই সময় তাঁর আবার একটা করোনারি অ্যাটাক হয়েছিল।

সেটা ছিল ছুটির দিন। সুশোভন অমরেশ সমরেশ দিবাকর— ভাইরা সবাই সেদিন বাড়িতেই ছিল। অ্যাটাকটা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তক্ষুনি তাঁকে নিয়ে সুশোভনরা হাসপাতালে ছুটেছিলেন। সেখানে দ্রুত একটা কেবিনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

হাসপাতালে নেবার ঘণ্টাখানেক বাদে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য জ্ঞান ফিরে এসেছিল বাবার। ওই রকম অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর আমুদে ফুর্তিবাজ মেজাজটা নষ্ট হয়নি। সুশোভনকে কাছে ডেকে দুর্বল ক্ষীণ গলায় বাবা বলেছিলেন, 'এবার আর হাসপাতাল থেকে আমার বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে পাবু। আমাকে আননোন স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য ট্রেনও এসে গেছে।'

বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন সুশোভন। বলেছিলেন, 'চুপ কর বাবা, চুপ কর—'

'সময় আর বেশী নেই পাবু। এখনই আমাকে স্টার্ট করতে হবে ; হুইসিল বাজল বলে। তার আগে একটা কথা বলে যাই—'

সুশোভন আবার তাঁকে থামতে বলেছিলেন।

বাবা শোনেন নি। তিনি বলেই গিয়েছিলেন, 'অলিম্পিকে মশাল নিয়ে ছোটে জানিস তো। দৌড়তে দৌড়তে রানার হাঁপিয়ে গেলে মশালটা আরেকজন রানারের হাতে দিয়ে রিটায়ার করে। এইভাবে সেটা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। আমাদের পরিবারের মশাল নিয়ে আমি এতদূর এগিয়েছি; আজ তোর হাতে সেটা আনুষ্ঠানিক-ভাবে দিয়ে গেলাম। এবার আমার রিটায়ার করার পালা। আর কোন দুর্ভাবনা নেই। লেট মী কুইট পীসফুলি। গুড বাই।' বলতে বলতে বাবা আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আধ ঘণ্টাও তিনি আর বেঁচে থাকেন নি।

বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। তিন দিনের জ্বরে মা মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় মা পরমার হাত ধরে বলেছিলেন, 'আমি চললাম বৌমা। আমার জায়গাটা এখন থেকে তোমার। সবাইকে দেখো।'

দুটি মানুষ সুশোভন আর পরমার হাতে তাঁদের উত্তরাধিকার দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

অবশ্য সংসার নিয়ে কোন রকম দুর্ভাবনা ছিল না। অমরেশরা সবাই অনেক আগেই নিজের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাবা-মা যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁদের খুব বড় একটা ভূমিকা ছিল না; তাঁরা ছিলেন অনেকটা টাইটুলার হেডের মতো। তবু ঐ দুটি মানুষ প্রাচীন কোন বৃক্ষের মতো সবার মাথায় ছাতা ধরে ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে জীবনের অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল যেন।

তবু কিছুই তো থেমে থাকে না। আর মা-বাবার মৃত্যু কোন অসাধারণ ঘটনাও নয়। জীবন আবার তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেতে শুরু করেছিল।

দেখতে দেখতে মসৃণ নিয়মে আরো ক'টা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে সুশোভনদের সংসারে চারটে নতুন মানুষ বেড়েছে। অমরেশের দুটো মেয়ে হয়েছিল, সমরেশের এক ছেলে আর দিবাকরের এক মেয়ে। বুবুনের পর সুশোভনের আর কোন ছেলেমেয়ে হয় নি; বুবুন

সে-সময় বড় হয়ে উঠেছিল; তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে পরমা তার গানবাজনা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে আগের মতো নয়। মা-বাবা বেঁচে থাকতে সংসার সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তা ছিল না। ওঁরা দু'জন পরমার গানের সবরকম সুযোগ করে দিয়েছিলেন। রেকর্ডিং প্লে-ব্যাক এবং মিউজিক কনফারেন্স—এই সব নিয়েই তখন দিনরাত সে মেতে থাকত। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর ফাঁকা জায়গাটা পরমাকে একটু একটু করে পূরণ করতে হয়েছে। সংসার নিয়ে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ার জন্য গানের ব্যাপারে খুব সময় পেত সে। রেওয়াজ টেওয়াজও সেভাবে করতে পারত না। তা ছাড়া প্রতি বছরই নতুন নতুন গায়িকা আসছিল, কম্পীটিসন বাড়ছিল। ফলে পরমার ডিম্যাণ্ড আগের মতো আর ছিল না; আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল। তবে একটা ব্যাপার সে ছাড়ে নি। ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কনফারেন্স হলে সে প্রোগ্রাম পাক বা না পাক শুনতে যেতই। একা যেত না, সুশোভনকেও সঙ্গে নিয়ে যেত।

সুশোভন প্রায়ই বলতেন, 'এটা তুমি কী করছ পরমা?'

পরমা জিজ্ঞেস করত, 'কী করছি?'

'এত কষ্ট করে গানের একটা কেরিয়ার তৈরি করলে; সেটা নিজের হাতে নষ্ট করে দিচ্ছ।'

'সংসার দেখতে হবে না?'

'সংসার দেখবার জন্য লোকের অভাব?'

'তা অবশ্য নেই। কিন্তু একজনকে হাল তো ধরতে হবে। মা নেই, এখন কি হুট হুট করে গানের জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারি?' বলে একটু থামত পরমা। পরক্ষণেই আবার শুরু করে দিত, 'ছেলেমেয়েগুলো বড় হচ্ছে। সুধাটা কাজের হলেও একদম তাল রাখতে পারে না। মাধুরীটা হদ্দ কুঁড়ে, আর অমিতটা ছেলেমানুষ। আমি যদি বাইরে বাইরে থাকি বাচ্চাগুলোকে দেখবে কে? ওরা মানুষ হবে কিভাবে?

সুশোভন বলতেন, 'সংসারের জন্যে নিজেকে তা হলে শেষ করে দিতে চাইছ ?'

'তুমিও তো সংসারের জন্যে কত স্যাক্রিফাইস করেছ। শেষ হয়ে গেছ বলে মনে হয় ?'

পরমাকে তখন অন্যরকম মনে হত। সে যে স্বার্থপর নয়, আত্মকেন্দ্রিক নয়, এই সংসারকে ঘিরেই তার সব কিছু, এ কথা ভাবতে ভাবতে পরমা সম্পর্কে সুশোভনের শ্রদ্ধা বেড়ে যেত। তার মধ্যে নিজের ছায়া দেখে ভারি ভালো লাগত। তবু সুশোভন বলতেন, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! আমার কি তোমার মতো একটা ব্রাইট কেরিয়ার ছিল ?'

পরমা বলত, 'দেখ, সংসারটা দাঁড় করানোও একটা বড় কাজ। তুমি ভেবো না।'

তা সত্ত্বেও ভাবতেন সুশোভন। নিজের কাজকর্মের ফাঁকে সময় পেলেই রেকর্ড কোম্পানি, সিনেমার প্রডিউসার—ডাইরেক্টর কি কনফারেন্সওলাদের সঙ্গে পরমার গানের ব্যাপারে যোগাযোগ করতেন। বাবা বেঁচে থাকতে এই দায়িত্বটা তিনিই নিয়েছিলেন। কারণ লোকের কাছে না গেলে সুযোগ-টুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুশোভনের এই যোগাযোগের ফল বেশ উৎসাহজনকই হয়েছিল।

যাই হোক এই পাঁচ বছরের মধ্যে সুশোভনের নিজস্ব কিছু ভালো হয়েছে। মনে পড়ে একদিন অফিসে যাবার পর তাদের ডিভিসনের কমিশনার হঠাৎ তাঁকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

কমিশনার সাহেবের নাম রাজনীশ আনন্দ; ভদ্রলোক পাঞ্জাবী হিন্দু। টকটকে রঙ, সাড়ে ছ ফুট হাইট, পুরোপুরি এরিয়ান চেহারা তাঁর। দারুণ জবরদস্ত অফিসার আনন্দ সাহেব, শতকরা এক শো ভাগ সৎ। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে একটা ঘষা কড়িও ট্যাক্স ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সততার জন্য সুশোভনকে তিনি দারুণ পছন্দ করতেন।

আনন্দ সাহেবের চেম্বারে ঢুকতেই তিনি সুশোভনের দিকে হা—

বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সামান্য হেসে মোটা গলায় বলেছিলেন, 'ব্যানার্জি, তোমাকে অ্যাডভান্স কনগ্র্যাচুলেশনস জানাচ্ছি।'

বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো সুশোভন আনন্দ সাহেবের হাতটা ধরেছিলেন, 'স্যার, কী ব্যপার আমি ঠিক—'

'আগে বোসো ; বলছি।'

সুশোভন বসতেই আনন্দ সাহেব বলেছিলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের কমিশনার কিছুদিন আগে তোমার নামটা রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছিলেন। খবর এসেছে তুমি প্রোমোশন পেয়েছ।'

'ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ।' খুশিতে এবং আবেগে গলার স্বর বুজে গিয়েছিল সুশোভনের।

বেয়ারাকে দিয়ে এরপর কফি আনিয়েছিলেন আনন্দ সাহেব। বলেছিলেন, 'হ্যাভ কফি—'

সুশোভন একটা কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দিয়েছিলেন।

আনন্দ সাহেব এবার বলেছিলেন, 'তোমার অর্ডারটা শীগগিরই এসে যাবে। ম্যাক্সিমাম টু উইকস্।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'একটা খবর শুনছি ব্যানার্জি—'

'কী স্যার?' সুশোভন উৎসুকভাবে তাকিয়েছিলেন।

'শুনছি গভর্নমেণ্ট ব্ল্যাকমানি আর ট্যাক্স-ইভেডারদের খুঁজে বার করবার জন্য ড্রাইভ নেবে। কালো টাকার জোরে স্মাগলাররা ব্ল্যাক মার্কেটীয়াররা প্যারালাল ইকনমি রান করাবার তালে আছে। তাদের ক্রাশ করে দিতে হবে। আমার ধারণা এ ব্যাপারে তোমাকে বিরাট রেসপনসিবিলিটি নিতে হতে পারে।'

'আমি স্যার সব সময় প্রস্তুত।'

'আই নো, আই নো।'

আনন্দ সাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে প্রোমোশনটার কথা ভাবছিলেন সুশোভন। এটা তাঁর সারা জীবনের সততা, দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার।

মনে আছে নিজের টেবলে ফিরে এসে সবে বসেছেন, মানেকলালের

ফোন এসেছিল। লোকটা তাঁকে এতকাল বাদেও ছাড়েনি, জামার তলায় অদৃশ্য পোকার মতো সে মাঝে মাঝে চুপচাপ পড়ে থাকত। আবার একেক সময় নড়েচড়ে উঠত। তখন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতেন সুশোভন।

মানেকলাল বলেছিল, 'আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব স্যার।'

সুশোভন নীরস গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী সারপ্রাইজ?'

'আপনি শীগগিরই একটা প্রোমোশন পাচ্ছেন।'

সুশোভন চমকে উঠেছিলেন। মানেকলাল এই খবরটা কোত্থেকে পেল? চমকটা গোপন করে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি অ্যাস্ট্রোলজি-টজি জানেন নাকি?'

মানেকলাল বলেছিল, 'না স্যার, এটা একটা ফ্যাক্ট। দু সপ্তাহের মধ্যে আপনি জেনে যাবেন।'

সুশোভন কী বলবেন ভেবে পান নি।

মানেকলাল আবার বলেছিলেন, 'কনগ্র্যাচুলেশনস স্যার। আপনার মতো এত কম বয়সে এত বড় প্রোমোশন খুব কম অফিসারই পেয়েছে। আপনার অনেস্টি, সেন্স অফ ডিউটি আর রেসপনসিবিলিটিকে স্যালুট জানাচ্ছি। কিন্তু স্যার—'

লোকটাকে সুশোভন ভয়ানক অপছন্দ করতেন। কিন্তু কিছুদিন পর পর তাঁর ফোন না এলে কেমন যেন ফাঁকা লাগত। একটা বিরক্তিকর অভ্যাসের মতো লোকটা গায়ের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল যেন। সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিন্তু কী?'

'খুবই অভদ্রতা হচ্ছে। তবু একটা কথা না জানতে পারলে ভালো লাগছে না। এই প্রোমোশনে মাইনেটা কত বাড়বে খবর পেয়েছেন?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমিই আপনাকে বলে দিচ্ছি। মাত্র পাঁচ শো আট টাকা।'

যে লোকটা তাঁর প্রোমোশনের খবর তাঁর চাইতে আগেই পেয়ে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই টাকার অঙ্কটা নির্ভুল বলেছে। কিন্তু অনেক

হয়েছে, আর নয়। এবার রূঢ়ভাবে সুশোভন বলেছিলেন, 'সো হোয়াট?'

'এত অনেস্টি এত পরিশ্রমের দাম মোটে পাঁচ শো আট টাকা! অবশ্য সততা-টততার জন্য আপনি লিজেণ্ডারি ফিগার হয়ে উঠতে পারবেন। লোকে আপনাকে নিয়ে মিথ-টিথ তৈরি করবে। কিন্তু একটা কথা বলব স্যার—'

মানেকলালকে থামিয়ে দিয়ে সুশোভন বলেছিলেন, 'কী কথা? আপনার সেই তিন লাখ টাকার প্রোপোজালটা তো?'

মানেকলাল বলেছিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কিছুই অজানা নেই।'

'কিন্তু যাদের জন্যে আপনি এত বছর ধরে আমার গায়ে জোঁকের মতো লেগে রয়েছেন তাদের তো হেভি ফাইন হয়ে গেছে। আর কেন?'

'স্যার, আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'কী কথা?'

'আমি হলাম একজন এজেন্ট। আমার হাতে আরো পঞ্চাশটা কোম্পানি আর পাঁচ শো ইনডিভিজুয়াল ক্লায়েন্ট রয়েছে। তাদের কয়েকটা ফাইল আছে আপনার কাছে। নতুন যারা ক্লায়েন্ট হবে তাদের কারো কারো ফাইলও যাবে আপনার কাছে। বুঝতেই পারছেন যতদিন বেঁচে থাকব, আপনার গায়ে আমাকে ঝুলে থাকতেই হবে। মানে ক্লায়েন্টদের দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন তাদের জন্যে কিছু কাজ তো করতেই হবে। আপনার সাহায্য ছাড়া কাজটা কি করে হয় বলুন।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'অনেকদিন লেগে আছি। এবার কি স্যার আপনার একটু করুণা পাব না?'

সুশোভন রেগে ওঠেন নি। মজা করে বলেছিলেন, 'আপনার টেনাসিটিকে দশ বার স্যালুট করছি কিন্তু কিছু লাভ হবে না।'

'পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত আমি অপ্টিমিস্ট। কোন কারণেই আমি আশা ছাড়ি না। শেষ পর্যন্ত দেখব, লাভ হয় কিনা। আমি স্যার আপনার সঙ্গে জুড়েই রইলাম।'

'আপনার ইচ্ছে। তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, যত অপ্টিমিস্টই আপনি হোন, আমার সম্বন্ধে আশা আপনাকে ছাড়তেই হবে।'

মনে পড়ে আনন্দ সাহেব আর মানেকলাল আগে থেকে যা বলেছিল তাই হয়েছিল; চোদ্দ দিনের মধ্যেই প্রোমোশনটা পেয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। আর যেদিন প্রোমোশনের অর্ডারটা তাঁর হাতে এসেছিল সেদিনই আনন্দ সাহেব তাঁকে ফোন করে বলেছিলেন, 'এক্ষুনি আমার ঘরে চলে এসো; জরুরী একটা কনফারেন্স আছে।'

আনন্দ সাহেবের চেম্বারে ঢুকতেই সুশোভনের চোখে পড়েছিল সেখানে তিনি একা নেই। আধখানা বৃত্তের মতো প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবলেব ওধারে আনন্দ সাহেব ছাড়া আরো দু'জন মধ্যবয়সী গম্ভীর চেহারার অচেনা ভদ্রলোক বসে আছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওঁরা হোমরা-চোমরা ভি-আই-পি। টেবিলটার এধারে অনেকগুলো ফোমের গদিওলা চেয়ার রয়েছে। সেখানে সুশোভনদেব ডিভিসনের কয়েকজন সিনিয়র অফিসার বসে ছিলেন। এই অফিসারদের তিনি চিনতেন। বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মতো এঁদেরও ডেকে আনা হয়েছে।

আনন্দ সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি সুশোভনকে বলেছিলেন, 'বোসো।'

অন্য অফিসারদের পাশে চুপচাপ বসে পড়েছিলেন সুশোভন। একটু অবাকও হয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ এতগুলো অফিসারকে ডেকে আনার কারণটা কী বোঝা যাচ্ছিল না। উৎসুক চোখে সুশোভন একবার আনন্দ সাহেব, আরেক বার সেই অচেনা ভি-আই-পিদের দেখছিলেন।

আনন্দ সাহেব প্রথমেই সেই ভদ্রলোক দু'টির পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, 'এঁরা আজই দিল্লী থেকে এসেছেন। দুজনেই ফিনান্স মিনিস্ট্রির ভেরি বিগ অফিসার। ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের অ্যাটিচুড সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলবেন। ওঁদের গাইড লাইন

পেলেই আমাদের এখানে ফিউচার প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করব।' বলে সেই অফিসার দু'জনের দিকে তাকিয়েছিলেন, 'স্যার, আমার সব অফিসার এসে গেছে। কাইণ্ডলি এবার যদি ওঁদের বলেন—'

দু'জনের মধ্যে যিনি বেশী গম্ভীর তিনি বলেছিলেন, 'ওয়েল জেণ্টলম্যান, আপনারা সবাই জানেন সারা দেশে বহু লোক গভর্নমেণ্টকে লাখ লাখ টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। ইট ইজ পোজিং এ ভেরি সীরিয়াস প্রবলেম। এ ছাড়া রয়েছে ব্ল্যাকমানির ব্যাপার, স্মাগলিং-এর ব্যাপার। কোটি কোটি কালো টাকা দেশের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। যে ভাবেই হোক ব্ল্যাকমানি আর ট্যাক্স-ইভেডারদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

সুশোভনের মনে পড়ে গিয়েছিল, ক'দিন আগে প্রোমোশনের খবর দেবার সময় আনন্দ সাহেব এরই আভাস দিয়েছিলেন।

সেই অফিসারটি থামেন নি। সমানে বলে যাচ্ছিলেন, 'ইট ইজ হাই টাইম ছাট উই শুড স্লপ ডাউন আপঅন ব্ল্যাকমানি অ্যাণ্ড রাইট নাউ। এটা ঠিক যে কেউ যেচে এসে কালো টাকা আমাদের হাতে তুলে দেবে না। বুদ্ধি করে সে সব বার করতে হবে। আপনারা সবাই এক্সপিরিয়েন্সড অফিসার; আপনাদের ওপর মিনিস্ট্রির প্রচুর আস্থা। প্রথমে আনন্দ সাহেবের সঙ্গে বসে আপনারা কয়েকটা স্কোয়াড তৈরি করুন; তারপর ডাউটফুল বাড়িগুলোর একটা লিস্ট করে নিন। বিশেষ করে নতুন নতুন মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস আর প্যালেসিয়াল বাংলোগুলোর ওপর নজর রাখবেন। কবে কোথায় স্কোয়াড হানা দেবে সেটা কমপ্লীট সিক্রেট রাখতে হবে। কেননা আগে থেকে খবর পেলে শিকার সাবধান হয়ে যাবে; কালো টাকা এমন জায়গায় সরিয়ে ফেলবে যে তার হদিসই পাওয়া যাবে না। আরেকটা কথা, দরকার হলে আপনারা পুলিশের হেল্প নেবেন। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ। উইশ ইউ অল দি বেস্ট।'

দিল্লীর সেই অফিসারেরা চলে যাবার পর সেদিনই আনন্দ সাহেব সাতটা স্কোয়াড তৈরি করে ফেলেছিলেন। একেকটা স্কোয়াডে মোট

আটজন করে লোক থাকবে। প্রতি স্কোয়াডের চার্জে থাকবেন একজন করে সিনিয়র অফিসার ; তাঁকে সাহায্য করবে দু'জন জুনিয়র অফিসার এবং পাঁচজন সাধারণ কর্মী। সুশোভন এই রকম একটা স্কোয়াডের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

স্কোয়াডগুলো তৈরি হয়ে যাবার পর আনন্দ সাহেব বলেছিলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। আপনাদের চারদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে ডাউটফুল বাড়িগুলোর একটা লিস্ট করে ফেলুন।'

'ঠিক আছে স্যার।'

মনে পড়ে আনন্দ সাহেবের চেম্বারে কনফারেন্স শেষ হতে হতে সেদিন অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন সুশোভন।

মেজাজটা সেদিন দারুণ ভালো ছিল। প্রথমতঃ প্রোমোশনের অর্ডারটা এসেছে। আর প্রোমোশন পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট দায়িত্বও পেয়ে গেছেন। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনাই অনুভব করছিলেন তিনি।

ক'দিন আগে আনন্দ সাহেব প্রোমোশনের ইঙ্গিত দিলেও বাড়িতে কারোকে কিছু বলেন নি সুশোভন। ভেবেছিলেন অর্ডারটা হাতে এলে সুখবরটা দেবেন।

অন্যদিন বাড়িটা সরগরম থাকত। বাচ্চাগুলো সামনের মাঠে ছোটাছুটি হুটোপাটি করে বেড়াত। সুধারা বিকেলে গা-টা ধুয়ে মাঠেরই এক ধারে বসে গল্প-টল্প করত আর বাচ্চাদের ওপর নজর রাখত। ভাইরা কেউ অফিস থেকে ফিরে এলে ওখানেই ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে-টুয়ে থাকত।

সেদিন কিন্তু কারোকেই দেখা যায় নি ; বাড়িটা কি রকম যেন নিঝুম মনে হয়েছিল।

একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বড় বড় পা ফেলে দোতলায় চলে এসেছিলেন সুশোভন। সেখানে আসতেই চোখে পড়েছিল তাঁর ঘরের সামনে

বাড়ির বাচ্চাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের ভেতরেও বেশ একটা ভিড়।

লম্বা বারান্দাটা পেরিয়ে দ্রুত ঘরে চলে এসেছিলেন সুশোভন। একধারে খাটের ওপর পরমা চোখ বুজে শুয়ে ছিল; আর তাকে ঘিরে সুধা মাধুরী আর অমিতা দাঁড়িয়ে ছিল।

ক'দিন ধরেই পরমার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছিল; সেই সঙ্গে গলায় ব্যথা। কথা বলতে গেলে স্বরটা ভাঙা ভাঙা শোনাচ্ছিল। পরমা বলেছিল, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা।' সুশোভনেরও তা-ই মনে হয়েছিল। অমরেশ ক'টা ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট দিয়েছিল; পরমা তাই খেয়ে যাচ্ছিল আর নুনজল গার্গল করছিল কিন্তু জ্বরটা সারছিল না। গলার স্বরটাও স্বাভাবিক হয় নি। তবে অমরেশ সুশোভন আর পরমা ভেবেছিল হয়ত একটু সময় লাগবে; তারপর সেরে যাবে। মোট এই ব্যাপারটা নিয়ে কারো খুব একটা দুশ্চিন্তা হয় নি। পরমা জ্বর আর গলাব্যথা নিয়েই সব কিছু করে যাচ্ছিল।

সেদিন সকালেও যখন অফিসে যান সুশোভনের মনে হয় নি সন্ধ্যে-বেলা বাড়ি ফিরে পরমাকে শুয়ে থাকতে দেখবেন। ক'ঘণ্টার মধ্যে কী এমন হতে পারে যাতে পরমা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে!

সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হয়েছে?' তাঁর চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল।

সুধা ওধার থেকে বলেছিল, 'দিদির জ্বরটা বিকেল থেকে খুব বেড়েছে। গলার স্বরটা আরো ভেঙে গেছে।'

'সে কি! অমু বাড়ি নেই; অন্য ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার সেনকে ফোন করেছি। এখুনি চলে আসবেন।' ডাক্তার সেন তাঁদের ওই পাড়াতেই থাকতেন।

সুশোভনদের কথাবার্তার মধ্যে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকিয়ে-ছিল পরমা। তার চোখ দুটো লালচে এবং ঘোলাটে। সুশোভনের একটা হাত ধরে সে বলেছিল, 'আমার কী হবে! আমি যে ভালো করে কথা বলতে পারছি না।'

তার গলা শুনে চমকে উঠেছিলেন সুশোভন। স্বরটা ভাঙা তো ছিলই ; বসে গিয়ে তখন খসখসে হয়ে গেছে। পরমার পাশে বসে তিনি বলেছিলেন, 'ডাক্তার আসছে। দেখুক, ওষুধ দিক, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার মন বলছে গলাটা আর ভালো হবে না। আমি আর গাইতে পাবব না।'

পরমার চুলে সস্নেহে বিলি কাটতে কাটতে সুশোভন বলেছিলেন, 'দূর বোকা ; আজেবাজে কথা অত ভাবতে নেই। অসুখ হলে কি আর সারে না ?'

পরমা আর কিছু বলে নি ; তার চোখের কোণ বেয়ে পোখরাজের দানার মতো দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

একটু পর ডাক্তার এসে গিয়েছিল। পরমাকে ভালো করে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ডাক্তার বলেছিল, 'জ্বরটা ইনফ্লুয়েঞ্জাই। কিন্তু গলাটা ট্রাবল দেবে মনে হচ্ছে। ওটা একটা ভীষণ ভালনারেবল পয়েণ্ট। সে যাক, ট্যাবলেট আর থ্রোট পেইণ্ট দিয়ে যাচ্ছি। যদি রিলিফ না হয় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

রাত্রে অমরেশও ফিরে এসে পরমাকে দেখে একই কথা বলেছিল। অর্থাৎ পরের দিন সকাল পর্যন্ত দেখা হবে। তারপর অবস্থা বুঝে যা করা দরকার করতে হবে।

ট্যাবলেট খেয়ে পরের দিন পরমার জ্বরটা কমে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু থ্রোট পেইণ্টে কোন কাজ হয় নি। গলার ব্যাপারটা একই রকম থেকে গেছে। কাজেই আবার সেই ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল ; অমরেশও ছিল। দু'জনই আরেকবার ভালো করে পরমাকে দেখেছিল। তারপব বলেছিল, 'আমার কি রকম যেন মনে হচ্ছে। আপনারা পেসেণ্টকে একজন ই-এন-টি স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যান। এঁকে এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।' অমরেশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি কী বলেন ?'

অমরেশ বলেছিল, 'আমারও তাই মত। ইমিডিয়েটলি স্পেশালিস্ট দেখানো দরকার।'

তখনই অমরেশরা ফোন করে একজন নামকরা ই-এন-টি স্পেশালিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছিল। স্পেশালিস্টের চেম্বারটা পার্ক স্ট্রীটে। ঠিক হয়েছিল অমরেশ সেদিন তার অফিসে যাবে না; বিকেল পাঁচটায় পরমাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটে চলে যাবে।

সুশোভনের অফিসে না গিয়ে উপায় ছিল না। একে প্রোমোশন পেয়েছেন, তার ওপর নতুন সার্চ স্কোয়াড তৈরি হয়েছে। কোথায় কোথায় সার্চ পার্টি যাবে তার লিস্ট তৈরি করতে হবে। তিনি অফিস থেকে ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে সোজা স্পেশালিস্টের চেম্বারে চলে যাবেন।

মনে পড়ে সেদিন অফিসে গিয়ে তিনি তাঁর জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে বসে পঁচিশটা সন্দেহজনক নামের তালিকা তৈরি করেছিলেন। তারপর সেটা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন আনন্দ সাহেবের কাছে। আনন্দ সাহেব লিস্টটা না দেখেই ফেরত দিয়েছিলেন, 'আমাকে দেখাবার কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি লিস্ট করেছ; আই নো দ্যাট উইল বী বেস্ট লিস্ট।' সুশোভনের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

আনন্দ সাহেব আবার বলেছিলেন, 'কবে থেকে সার্চ শুরু করতে চাও?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'আপনি যেদিন থেকে বলবেন।'

'তোমার স্কোয়াড রেডি তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

'দেন ডোণ্ট ডিলে। কাল থেকেই শুরু করে দাও—'

আনন্দ সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে সুশোভন আবার নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন। প্রোমোশন পাবার পর সেদিন থেকে তাঁর নিজস্ব একটা চেম্বার হয়েছিল।

লিস্টটা আরো বার কয়েক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্ক্রুটিনি করতে করতে আর কিভাবে কার ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে সার্চ শুরু করবেন তার স্ট্র্যাটেজি ভাবতে ভাবতে চারটে বেজে গিয়েছিল। অফিসের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পরমার চিন্তাটা ছিলই। চারটে বাজবার পর তিনি আর এক

সেকেণ্ডও অফিসে থাকেন নি ; একটা ট্যাক্সি ডেকে পার্ক স্ট্রীটে চলে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে অমরেশ আর পরমাও পৌঁছে গেছে।

ঘণ্টাখানেক ধরে পরমাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করার পর স্পেশালিস্টের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। আলাদা করে সুশোভন আর অমরেশকে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, 'দেখুন, কেসটা আমার ভালো মনে হচ্ছে না। পেশেণ্টের গলায় একটা গ্রোথ হয়েছে। আই সাসপেক্ট—'

সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী সন্দেহ করছেন ?'

স্পেশালিস্ট বলেছিলেন, 'এখনই ঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আমার মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বায়োপ্সি করানো দরকার।'

অবরুদ্ধ গলায় সুশোভন এবার বলেছিলেন, 'আপনি কি মনে করেন ওটা ক্যান্সার—'

'বায়োপ্সি রিপোর্ট না পেলে কারেক্ট ডায়াগনোসিস করা যাচ্ছে না। আই প্রে ওটা যেন ম্যালিগনাণ্ট গ্রোথ না হয়। আপনারা আর দেরি করবেন না ; কালকেই পেশেণ্টকে ক্যান্সার হসপিটালে নিয়ে যান।'

শুনতে শুনতে গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিলেন সুশোভন। বুকের ভেতর অসহ্য এক কষ্ট পাষাণভারের মতো চাপ দিয়ে যাচ্ছিল যেন। তবে পরমাকে সেদিন স্পেশালিস্টের কথা কিছুই বলেন নি তিনি। পরের দিন অফিসে যান নি সুশোভন। পরমাকে নিয়ে সকালেই ক্যান্সার হাসপাতালে চলে গিয়েছিলেন। সঙ্গে অমরেশ ছিল।

মনে আছে ক্যান্সার হাসপাতালে ট্যাক্সিটা যখন ঢুকছে সেই সময় চমকে উঠেছিল পরমা। ভাঙা ভাঙা খসখসে অস্পষ্ট গলায় বলেছিল, 'এখানে নিয়ে এলে কেন ?'

সুশোভন উত্তর দেন নি। সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল অমরেশ। ঘাড় ফিরিয়ে সে বলেছিল, 'এখানে তোমার শরীরের ছোটখাটো দু-একটা পরীক্ষা হবে। কিচ্ছু ভয় নেই।'

'আমার কি ক্যান্সার হয়েছে ?'

'আরে না-না ; ওসব কিছু না। এখানে ক্যান্সার ছাড়াও অন্য নানারকম পরীক্ষা হয়। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

পরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। সীটের পেছন দিকে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছিল। তার ঠোঁট দুটো কুঁচকে কুঁচকে যাচ্ছিল আর চোখের কোণ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে আসছিল।

পরমার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে সুশোভন ঝাপসা গলায় বলেছিলেন, 'কেঁদো না, কেঁদো না।'

ক্যান্সার হাসপাতালের স্পেশালিস্টরা পরমাকে ভালো করে দেখে তক্ষুনি ওখানে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। জেনারেল ওয়ার্ডে ফ্রী বেড পাওয়া যায় নি ; তাই কেবিনে পেয়িং বেডের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল দিন সাতেক ওখানে থাকবে পরমা ; কেননা বায়োপ্সি এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য ওই সময়টা দরকার।

পরমাকে কেবিনে নিয়ে যাবার সময় সুশোভন আর অমরেশও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। সেখানে গিয়েই সুশোভনের একটা হাত জড়িয়ে ধরে পরমা বলেছিল, 'আমার মন বলছে আর বাঁচব না।'

সুশোভন শ্বাসরুদ্ধের মতো বলেছিলেন, 'এ সব কথা বলতে নেই পরমা।'

মনে পড়ে পরমাকে ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি করার পরের দিন থেকেই সুশোভন তাঁর স্কোয়াড নিয়ে সার্চ শুরু করেছিলেন।

সুশোভনের 'জোন' ছিল পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে রাসেল স্ট্রীট থেকে থিয়েটার রোড পর্যন্ত। এখানেই কলকাতার নতুন স্কাই-স্ক্রেপার কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে।

মনে আছে প্রথম দিন ক্যামাক স্ট্রীটের একটা মাল্টি-স্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের থারটিনথ ফ্লোরের একটা ফ্ল্যাটে তাঁর স্কোয়াড আচমকা হানা দিয়েছিল। ফ্ল্যাটের মালিকের নাম মোতিচাঁদ কেজ্রিরওয়াল। লোকটার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের একটা বিজনেস ছিল ; সেটা বাইরে দেখাবার জন্য। ভেতরে ভেতরে সে দুর্দান্ত স্মাগলার। পুলিস এবং ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে তার নামে অনেক রিপোর্ট ছিল।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে ধরাছোঁয়া যায় নি ; বার বার হাতের মুঠো থেকে পিছলে পিছলে সে বেরিয়ে গেছে।

অটোমেটিক লিফটে থারটিন ফ্লোরে উঠে কলিং বেল টিপতেই ধবধবে উর্দি পরা বেয়ারা দরজা খুলে দিয়েছিল, 'কিসকো মাংতা সাব ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'কেজিরওয়াল সাব হ্যায় ?'

'জী। আইয়ে—' বেয়ারাটা সুশোভনদের নিয়ে চমৎকার সাজানো একটা ড্রইং রুমে বসিয়েছিল। তারপর কেজিরওয়ালকে খবর দিতে ভেতরে চলে গিয়েছিল।

একটু পরেই কেজিরওয়াল এসেছিল। বয়স পঞ্চাশের মতো। দারুণ ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা। শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। টকটকে গায়ের রঙ, নিখুঁত কামানো মুখ। পরনে টেরিকটের বেল-বটস আর নকশা-করা হাইনেক গুরু পাঞ্জাবি, পায়ে ফোমের চটি।

সুশোভনের পরিচয় এবং তার আসার উদ্দেশ্য শুনে কেজিরওয়াল বিনয়ে যেন গলে গিয়েছিল, 'নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই। বাড়ি সার্চ করতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। একজন অনেস্ট সিটিজেন হিসেবে আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। সার্চ করার আগে কী খাবেন বলুন—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'থ্যাঙ্কস্, কিচ্ছু দরকার নেই।'

'স্যার আপনি এসেছেন। সামান্য হসপিটালিটির সুযোগ দেবেন না ?'

'ক্ষমা করবেন।'

'একটা সফট ড্রিঙ্ক বা এক কাপ কফি খেলে কোনরকম অবলি-গেসনে পড়তে হয় বলে মনে হয় না। আমার একটু ভালো লাগত, এই আর কি।'

সুশোভন আবেগশূন্য ভারী গলায় বলেছিলেন, 'মিস্টার কেজির-ওয়াল, নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আমি এখনই সার্চ শুরু করতে চাই। তার আগে আপনাকে ক'টা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।'

'অবশ্যই স্যার।' কেজিরওয়াল হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়েছিল, 'জাস্ট এ মিনিট ; আমি একটু ভেতর থেকে আসছি।'

লোকটার এই ব্যস্ততা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয়েছিল সুশোভনের। বলেছিলেন, 'ভেতরে কেন? আমি এখানে বসেই আপনাকে প্রশ্ন করছি।'

'স্যার, আপনি সার্চ করবেন। নিশ্চয়ই আমার ফ্ল্যাটের সবগুলো ঘরে যাবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমরা কলকাতার এই পুরনো সাহেব পাড়ায় থাকি। আমি নিজে মনেপ্রাণে সাহেবও। আমাকে দেখে, আমার পোশাকটোশাক আর ফ্ল্যাটের চেহারা দেখে নিশ্চয়ই আমাকে ট্র্যাডিশনাল ইণ্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছে না। তবে স্যার একটা ঝামেলা আছে—'

'কিসের ঝামেলা?'

'লাইফের অ্যাটিচুডের ব্যাপারে আমি যতটা ইউরোপ আমেরিকার দিকে এগিয়েছি আমার ফ্যামিলি ঠিক ততটাই পিছিয়ে আছে। মানে আমাদের মেয়েমহলে ইণ্ডিয়ার নাইটিনথ সেঞ্চুরিটা পুরোপুরি 'রেইন' করছে। আপনি হঠাৎ ভেতরে গেলে মেয়েরা অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। তাই ওদের একটু বলে আসতে যাচ্ছি।'

এক পলক ভেবে নিয়ে সুশোভন বলেছিলেন, 'আমরা যেখান দিয়ে ঢুকলাম সেটা ছাড়া এই ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার আর কোন প্যাসেজ আছে?'

একটু অবাক হয়েই তাকিয়েছিল কেজিরওয়াল। তারপর হেসে ফেলেছিল, 'না স্যার, আর কোন প্যাসেজ নেই। এনট্রি আর একজিট্, সব ওই একটা জায়গা দিয়েই।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'ভয় নেই স্যার, পালাব না। আমি একজন সৎ নাগরিক।' সৎ শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়েছিল কেজিরওয়াল।

'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

কেজিরওয়াল বেরিয়ে যেতেই সুশোভন একজন অফিসারকে বাইরের প্যাসেজে নিয়ে তার এবং বাড়ির অন্য লোকদের ওপর লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন। আসলে কেজিরওয়ালের কথা তাঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি।

তিন চার মিনিট বাদে কেজিরওয়াল সত্যি সত্যি ফিরে এসেছিল। বাইরের প্যাসেজে সেই জুনিয়ার অফিসারটি তখনও দাঁড়িয়ে। তাকে দেখিয়ে কেজিরওয়াল বলেছিল, 'আমাকে বোধহয় বিশ্বাস করেন নি। তাই ওখানে ওয়াচ বেখেছেন!' বলে ভারি মিষ্টি করে হেসেছিল। এই হাসিটা তার অ্যাসেট।

এ কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি সুশোভন। সোজা কেজিরওয়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'নাউ অন-টু বিজনেস। আপনার এই ফ্ল্যাটটার ফ্লোর এরিয়া কত? আপনি যা স্টেটমেণ্ট দেবেন সেটা রেকর্ড করে নিচ্ছি। পরে সেগুলো মিলিয়ে দেখব।'

'অবশ্যই স্যার। এই ফ্ল্যাটের ফ্লোর এরিয়া দু হাজার স্কোয়ার ফুট।'

আরেক জন জুনিয়ার অফিসারকে নোট নিতে বলে সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কত দাম দিয়ে কিনেছিলেন?'

কেজিরওয়াল বলেছিল, 'দেড় লাখ টাকা।'

'পার স্কোয়ার ফুট কত পড়ল?'

'পঁচাত্তর টাকা।'

চারদিক ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন সুশোভন। ফ্লোর খুব দামী টাইলস দিয়ে মোড়া, দেয়াল ডিসটেম্পার করা। ইলেক্‌ট্রিক অয়ারিং বাইরে থেকে দেখা যায় না; দেয়ালের ভেতর সেগুলো গোপন রয়েছে। তাঁর ধারণা অন্য ঘরগুলোও এই রকমই হবে। তার ওপর এটা 'পশ' চৌরঙ্গী পাড়া। এখানকার প্রতি স্কোয়ার ফুটের দাম এত কম হওয়া অকল্পনীয় ব্যাপার। সুশোভন বলেছিলেন, 'ওনলি সেভেনটি ফাইভ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।' কেজিরওয়াল দারুণ সরল আর নিষ্পাপ মুখ করে বলে গিয়েছিল, 'আমার পেপারস সব রেডি রয়েছে। আপনি বললেই দেখিয়ে দেব।'

'কত টাকা ব্ল্যাক দিয়েছেন?'

'ব্ল্যাক টাকা!' বলে এমন ভাবে কেজিরওয়াল তাকিয়েছিল যেন ওই শব্দটা জীবনে সেই প্রথম শুনেছে। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলেছিল, 'আপনাকে স্যার আগেই বলেছি আমি একজন অনেস্ট সিটিজেন। আমার স্লেট একেবারে ক্লিন।'

সুশোভন আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, বাইরের প্যাসেজ থেকে হঠাৎ সেই জুনিয়ার অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'স্যার—'

চমকে সেদিকে তাকাতেই সুশোভন দেখতে পেয়েছিলেন তিনজন মহিলা জুনিয়র অফিসারটির পাশ দিয়ে বাইরের দরজার দিকে চলে যাচ্ছে। তাদের পরনে রাজস্থানের ট্র্যাডিশনাল পোশাক—জরি আর চুমকি বসানো ঝকমকে শাড়ি, কনুই পর্যন্ত ব্লাউজের হাতা ইত্যাদি। তাদের পায়ে রূপোর মোটা মোটা খাড়ু, কোমরে সোনার জবরজং পৈছা।

তিনজনের কারোরই মুখ দেখা যাচ্ছে না; গলা পর্যন্ত সবার ঘোমটা। কেজিরওয়াল যা বলেছিল, দেখা যাচ্ছে তা-ই। নাইনটীনথ সেঞ্চুরি ওদের বাড়ির অন্দরমহলে শেকড় গেড়ে বসে আছে।

দেখতে দেখতে চোখদুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল সুশোভনের। তিনজন মহিলার মধ্যে দুজন অস্বাভাবিক লম্বা; মেয়েদের মধ্যে এরকম হাইট দেখা যায় না।

জুনিয়র অফিসারটি আবার চিৎকার করে উঠেছিল, 'স্যার, এরা বেরিয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলেন সুশোভন। তারপর দৌড়ে প্যাসেজ পেরিয়ে বাইরে যাবার সেই দরজাটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর মহিলা তিনটিকে বলেছিলেন, 'বাহার মাত যাইয়ে—'

মহিলা তিনটি একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে কেজিরওয়ালও দৌড়ে এসেছে। বলেছিল, 'এ কি করছেন স্যার, কাইগুলি ওদের যেতে দিন। আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের অর্থোডক্স কনজারভেটিভ ফ্যামিলি। বাড়িতে অচেনা পুরুষ-মানুষ সব ঘেঁটে দেখবে; ওরা ভীষণ শাই ফীল করছে। কারণ—' বলেই মুখটা সুশোভনের কানের কাছে এনে ঝপ করে গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছিল, 'ওরা তিনজনেই প্রেগনান্ট। এই বাড়িতেই টেনথ ফ্লোরে আমাদের এক রিলেটিভ আছেন; যতক্ষণ সার্চ হবে ওরা ওখানেই থাকবে। তারপর চলে আসবে। প্লীজ স্যার অনুমতিটা দিন—'একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো সমানে বলে গিয়েছিল কেজিরওয়াল।

সুশোভন লক্ষ্য করেছিলেন, তিনটি মহিলারই শরীরের মধ্যভাগ বেশ স্ফীত; বেশ অ্যাডভান্স স্টেজেই তারা রয়েছে। কিন্তু আগে থেকেই যে সন্দেহটা হয়েছিল সেটা হঠাৎ যেন বেড়ে গিয়েছিল। খুব চাপা গলায় সুশোভন বলেছিলেন, 'একসঙ্গে আপনাদের বাড়িতে তিনজন প্রেগনান্ট হয়েছেন! স্ট্রেঞ্জ!'

'সবই ভগবানের লীলা। মানুষের কোন হাত নেই এতে।'

'আপনি তো হানড্রেড পারসেন্ট সাহেব। ভগবান-টগবান মানেন দেখছি!'

'ঐ একটা জায়গায় আমি পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান থেকে গেছি।'

'এটাও ঈশ্বর-লীলা, না কি বলেন?'

'একজাক্টলি।'

সুশোভন এবার বলেছিলেন, 'ওঁরা কারা?'

কেজিরওয়াল বলেছিল, 'আমার তিন স্ত্রী। আপনি স্যার ভুরু কোঁচকাবেন না, হিন্দু কোড বিল পাস হবার আগেই আমি তিনটি বিবাহ করি। তিন বিয়েরই উইটনেস আর ইনভিটেশন কার্ড—সব রেডি আছে।'

'আপনি দেখছি বে-আইনি কোন কাজ করেন না!'

'কোন সৎ নাগরিক কি তা করে স্যার?'

'রাইট। কিন্তু তিনটে স্ত্রী নিয়ে একই ফ্ল্যাটে আছেন। স্বীকার করতেই হবে আপনার ক্ষমতা আছে। এরকম সহাবস্থান আগে আর কখনও দেখি নি।'

কেজিরওয়াল তার সেই অ্যাসেট অর্থাৎ মিষ্টি হাসিটা উপহার দিয়ে বলেছিল, 'থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেণ্ট। একটা কথা বলতে পারি, একসঙ্গে থাকলেও আমরা খুব সুখী ; উই আর এ হ্যাপি ফ্যামিলি।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'ভেরি গুড। এবার কাজের কথায় আসা যাক। একটু আগে বললেন, আপনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। আমার মনে হয় ঈশ্বর আমার মধ্য দিয়ে আপনাকে কিছু লীলা দেখাবেন।'

'দেখব স্যার। তার আগে মহিলাদের যেতে দিন।'

'ওঁদের যেতে দেওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরের লীলাটা যে ওঁদের নিয়েই।'

কেজিরওয়ালের মুখের চেহারা এক সেকেণ্ডের মধ্যে বদলে গিয়েছিল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি স্থির। সে চাপা গলায় বলেছিল, 'স্যার আপনাকে আরেক বার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ফ্যামিলি অত্যন্ত রেসপেক্টেবল আর অর্থোডক্স।'

'আমার মনে আছে। তবে আরেক বার মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

'অনুগ্রহ করে ওদের আর আটকে রাখবেন না। আপনারা ফ্ল্যাট সার্চ করতে এসেছেন ; তাই করুন। আমার ফুল কো-অপারেশন পাবেন।'

সুশোভন কেজিরওয়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'আপনার স্ত্রীরা চলে গেলে ফ্ল্যাট সার্চ করে কি কিছু লাভ হবে?'

কেজিরওয়াল চাপা গলায় শিসের মতো শব্দ করে বলেছিল, 'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'ভেরি সিম্পল। আপনার স্ত্রীদের সার্চ না করে আমি বাইরে যেতে দেব না।'

দাঁতে দাঁত চেপে কেজিরওয়াল বলেছিল, 'আপনি কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন—'

সুশোভন তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্যাসেজের সেই জুনিয়ার অফিসারটিকে বলেছিলেন, 'ঘোষ, ড্রইং রুমে টেলিফোন রয়েছে। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে কানেক্ট করে বলে দাও ক'জন মহিলা পুলিশ যেন ইমিডিয়েটলি পাঠিয়ে দেয়।'

কুড়ি মিনিটের মধ্যে এক ঝাঁক মেয়ে পুলিশ এসে গিয়েছিল। তারপর কেজিরওয়ালের তিন গর্ভবতী স্ত্রীকে সার্চ করতে গিয়ে শাড়ি আর ঘোমটার তলা থেকে দুটি ঢ্যাঙা চেহারার ঝাঁকড়া গোঁফওয়ালা পুরুষ বেরিয়ে পড়েছিল ; আরেক জন অবশ্য মহিলাই। তাদের তিন-জনেরই পেটের ভাঁজ থেকে তিরিশ লাখ টাকার নোট আর দেড় লাখ টাকার মতো আমেরিকান ডলার বার করা হয়েছিল।

টাকা বার করে সুশোভন সেই ঢ্যাঙা লোক দু'টিকে দেখিয়ে কেজিরওয়ালকে বলেছিলেন, 'গোঁফওলা মেয়েমানুষ এই প্রথম দেখলাম। এই ম্যাজিকটা দেখাবার জন্যে ধন্যবাদ। এখন অনুগ্রহ করে আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে। সঙ্গে আপনার দুই গোঁফওলা মিসেস আর এক গোঁফছাড়া মিসেসকেও যেতে হবে।'

তার পরের দিন মিডলটন স্ট্রীটের একটা পশ ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছিলেন সুশোভনরা। এই ফ্ল্যাটটার মালিক একজন গুজরাটি—নাম পরমেশ প্যাটেল। কেজিরওয়ালের মতো প্যাটেলও ঝকঝকে সাহেব এবং তার মতোই ঈশ্বরবিশ্বাসী। তার ফ্ল্যাটের একটা বড় ঘরে বিরাট শিবলিঙ্গ রয়েছে। ফুল, বেলপাতা, সুগন্ধি আগরবাত্তি ধূপ, চন্দন, মালা ইত্যাদিতে পুজোর ঘরটায় দারুণ অ্যাটমসফীয়ার তৈরি হয়ে ছিল।

যাই হোক প্যাটেল লোকটা সার্চের ব্যাপারে খুবই সহযোগিতা করেছে। নিজের হাতে আলমারি খুলে দিয়েছে, খাট-বিছানা উলটপালট করেছে, বাথরুমের টাব সরিয়ে দেখিয়েছে। কিন্তু গোটা ফ্ল্যাট তোলপাড় করেও সুশোভনরা কিছুই বার করতে পারেন নি।

দু ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর যখন সুশোভনরা হতাশ হয়ে পড়েছেন, ফিরে যাবেন ভাবছেন, হঠাৎ পুজোর ঘরটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা তাঁর চিন্তার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। ব্যস্তভাবে তিনি বলেছিলেন, 'প্যাটেল সাহেব, আপনার পুজোর ঘরে একবার যেতে চাই।'

তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে সুশোভনকে দেখতে দেখতে শিবভক্ত প্যাটেল জিজ্ঞেস করেছিল, 'একটু আগেই তো দেখে এলেন স্যার—' তার কপালে ক্রমশ গভীর রেখায় ভাঁজ পড়ে যাচ্ছিল।

সুশোভন প্যাটেলের মুখচোখের চেহারা লক্ষ্য করতে করতে বলেছিলেন, 'তখন শিবশম্ভুকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাবার আগে প্রণামটা করে নিই—'

খুব সম্ভব এর আগে এরকম ঈশ্বরভক্ত অফিসার ছাখে নি প্যাটেল। আস্তে আস্তে তার চোখের দৃষ্টি আবার স্বাভাবিক হয়েছিল; কপালের চামড়া আবার মসৃণ হয়েছিল। আগ্রহের সুরে সে বলেছিল, 'আসুন, আসুন—'

প্যাটেলের সঙ্গে তার পুজোর ঘরে গিয়ে দুই হাত জোড় করে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ বিশাল শিবলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুশোভন। তাঁর স্কোয়াডের অন্য লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শিব-লিঙ্গটা কি পাথরের তৈরি?'

প্যাটেল বলেছিল, 'হ্যাঁ স্যার; জয়পুর থেকে কালো পাথর আনিয়ে বানিয়ে নিয়েছি।'

'ভারী সুন্দর হয়েছে। জয়পুরী পাথর ছাড়া এরকম জেল্লা বেরোয় না—' বলতে বলতে প্যাটেল কিছু বুঝবার বা বাধা দেবার আগেই এক লাফে সুশোভন শিবলিঙ্গের কাছে চলে গিয়েছিলেন।

প্যাটেল এক সেকেণ্ড বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর সে-ও দৌড়ে চলে এসেছিল, 'কী হল স্যার—কী হল—' বাইরে

কোন উত্তর না দিয়ে সুশোভন এক টানে শিবলিঙ্গটাকে

ফেলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর ছোট্ট স্টিলের সিন্দুক দেখা গিয়েছিল। বাইরে থেকে পাথরের মনে হলেও শিবলিঙ্গটা আসলে প্ল্যাস্টিকের তৈরি ; তার ওপর কালো পেইন্ট আর চকচকে ল্যাকার লাগানো হয়েছে।

সুশোভন চোখের কোণ দিয়ে প্যাটেলের দিকে তাকিয়ে তারিফের গলায় বলেছিলেন, 'ক্যামোফ্লেজটা কিন্তু দারুণ করেছিলেন। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইট ভেরি মাচ। এবার সিন্দুকের চাবিটা বার করুন।'

প্যাটেল চাবি দিয়েছিল। তারপর সিন্দুকটা খুলতেই সাত আট লাখ টাকার সোনার বার বেরিয়ে পড়েছিল।

তৃতীয় দিন সার্কুলার রোডের এক মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ফিফটীনথ ফ্লোরের এক ফ্ল্যাটে সার্চ করতে গিয়েছিলেন সুশোভন। লিফটে করে ওপরে উঠে কলিং বেল টিপতেই যে মেয়েটি দরজা খুলে দিয়েছিল তার মতো সেক্সি ফিগার আগে আর কখনও ছাখেন নি সুশোভন। ইংরেজিতে যাকে বলে ভলাপচুয়াস, সে হচ্ছে অবিকল তাই। মেয়েটার ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস ছত্রিশ-ছাব্বিশ-ছত্রিশ হবে। বয়স সাতাশ-আটাশ। গায়ের রঙ পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো। সে ব্লণ্ড অর্থাৎ স্বর্ণকেশিনী। তার পরনে সেই মুহূর্তে ছিল একটা পাতলা এবং স্বচ্ছ হাউসকোট। কোটটার গলা থেকে পা পর্যন্ত অনেকগুলো বোতাম রয়েছে। কিন্তু কোমরের কাছে একটি মাত্র বোতামই আটকানো। মাঝে মাঝে উলটো-পালটা হাওয়ায় তার কোটটা সরে সরে যাচ্ছিল। ফলে ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের মতো তার শরীরের কোন কোন অংশ বেরিয়ে পড়ছিল।

মেয়েটার চোখ বাজপাখির চোখের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু হাসিটা চমৎকার। ঠোঁটে আর চোখে হাসি নিয়ে খেলতে খেলতে সে সুন্দর ইংরেজিতে এবং নিখুঁত উচ্চারণে বলেছিল, 'আপনার জন্য আমি কী করতে পারি ?'

সুশোভন কেন এসেছেন, এটা সে সরাসরি জিজ্ঞেস করে নি।

বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটা আদব-কায়দা জানে। সুশোভন বলেছিলেন, 'এটা কি মিস্টার বিলিমোরিয়ার ফ্ল্যাট ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি আছেন ?'

'না, কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন।'

'কখন ফিরবেন ?'

'ঠিক নেই।'

তখন দুপুর। মেয়েটা আবার বলেছিল, 'সন্ধ্যের আগে ফিরবেন বলে মনে হয় না।'

একটু ভেবে সুশোভন বলেছিলেন, 'আপনি কি মিসেস বিলিমোরিয়া ?'

'এক কথায় ঠিক আমার পরিচয়টা দেওয়া যাবে না ; একটু এলাবরটলি বলতে হবে। ইজ ইট নেসেসারি ?'

'না শুনে বলতে পারছি না।'

'দেন ইট ইজ অলরাইট। আমার নাম মধুর পারদাসানি। বিলিমোরিয়া আমার বয় ফ্রেণ্ড। কোন একদিন হয়ত আমরা বিয়ে করব ; তবে বিলিমোরিয়া বা আমার কারো দিক থেকেই তাড়া নেই। ফর ইওর ইনফরমেশন একটা কথা বলতে পারি—উই লিভ হিয়ার অ্যাজ ম্যান অ্যাণ্ড ওয়াইফ। প্রি-নাপসায়াল মানে বিয়ের আগেই আমরা বিবাহিত জীবনের একটা স্টেজ রিহার্সাল দিয়ে নিচ্ছি—'

মেয়েটা অর্থাৎ মধুর পারদাসানির এতটুকু আড়ষ্টতা বা সংকোচ নেই। দারুণ স্বাভাবিক গলায় কথাগুলো বলে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই ইনফরমেশনে কাজ হবে ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'হবে।' তারপর কী উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন সেটা জানিয়ে দিয়ে আবার বলেছিলেন, 'আশা করি এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

মধুরের বাজপাখির মতো চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, 'আজই সার্চ করবেন ? একটা কথা বলব ?'

'কী কথা ?'

'অনুগ্রহ করে কাল আসুন। প্লীজ—'

'তা হয় না। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। ইচ্ছা করলে আপনি মিস্টার বিলিমোরিয়াকে ফোন করে খবর দিতে পারেন। ততক্ষণ আমরা ওয়েট করব; উনি এলে সার্চ শুরু হবে '

কয়েক সেকেণ্ড কী ভেবেছিল মধুর। তারপর বলেছিল, 'আচ্ছা আসুন—' সুশোভনদের ড্রইং রুমে বসিয়ে সে আবার বলেছিল, 'বিলিমোরিয়াকে ধরতে পারব না; এই মুহূর্তে সে কোথায় রয়েছে আমি জানি না। এনিওয়ে আপনি যখন সার্চ করবেনই তখন তো আর আটকানো যাবে না। প্লীজ পাঁচ মিনিট সময় দিন; আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি—'

'ঠিক আছে, পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

মধুর বলেছিল, 'পালাবো কেন? আমি তো অন্যায় করি নি!'

'দ্যাটস গুড।'

মধুর চলে গিয়েছিল। ঠিক পাঁচ মিনিট বাদেই ওধারের কোন একটা ঘর থেকে তার গলা ভেসে এসেছিল, 'অফিসার, আপনি এ ঘরে আসুন। কাইণ্ডলি একলা আসবেন; পরে আপনার স্কোয়াডকে ডাকবেন।'

মধুর সুশোভনকেই ডেকেছিল। একা একা যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। জুনিয়ার অফিসারদের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করে সুশোভন ঠিক করেছিলেন একা গিয়েই ব্যাপারটা দেখবেন। এদিকে স্কোয়াডের অন্য লোকেরা এ ঘরে সতর্ক হয়ে থাকবে; তিনি ডাকলেই তারা দৌড়ে যাবে।

ড্রইং রুমের পাশ দিয়ে প্যাসেজ চলে গেছে। তাঁর বাঁ পাশে পর পর ঘর। ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে দুখানা ঘর বাদ দিয়ে তৃতীয় ঘরের দরজার কাছে আসতেই সুশোভন দেখতে পেয়েছিলেন ভেতরে একটা গোল রিভলভিং খাটে মধুর বসে আছে। তার পরনে এখন আর সেই জালের মতো স্বচ্ছ লুক-থ্রু, হাউসকোটটা নেই। এখন সে পায়ের

পাতা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা একটা জমকালো রঙের ম্যাক্সি পরে ব
আছে। চোখাচোখি হতেই মধুর ডেকেছিল, 'আসুন অফিসার—'

স্নায়ুগুলোকে সজাগ রেখে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়েছিলেন সুশোভন।

ফ্লোরে ছ ইঞ্চি পুরু পার্সিয়ান কার্পেট। চারদিকের দেয়াল ঘেঁষে দামী ফ্যাশানেবল রেডিওগ্রাম, ড্রেসিং টেবিল, বুক-কেস, সোফা ইত্যাদি ইত্যাদি চমৎকার করে সাজানো ছিল। মাথার ওপর সিলিং থেকে কাচের বাহারী শ্যাণ্ডেলীয়ার ঝুলছিল। দু ধারের দেয়ালে দুটো এয়ারকুলার বসানো ; অবশ্য সে দুটো এখন চালু নেই। তবে রেডিও-গ্রামে টুংটাং করে উত্তেজক ওয়েস্টার্ন মিউজিক বেজে যাচ্ছিল।

মাঝখানে গোল রিভলভিং বেডটা মধুরকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছিল।

মধুর একটা সোফা দেখিয়ে বলেছিল, 'বসুন স্যার—'

সুশোভন বসতে বসতে বলেছিলেন, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঈষৎ ভারী রক্তাভ ঠোঁটদুটো স্ফুরিত করে মধুর বলেছিল, 'আপনারা মানে সরকারী অফিসাররা বড্ড ড্রাই ; ভীষণ কাঠখোট্টা। আমার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে পাঁচ-দশ মিনিট গল্প করতে কি আপনার ইচ্ছে করছে না ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'করে ; নিশ্চয়ই করে। কিন্তু তার জন্য অন্য সময় আছে।'

'আপনি ভীষণ ক্রুয়েল। কাজ ছাড়া কিচ্ছু বোঝেন না।'

'রাইট।'

'ঠিক আছে, কাজের কথাতেই আসা যাক। আচ্ছা অফিসার, আপনি কখনও ম্যাজিক দেখেছেন ?'

সুশোভন ভয়ানক বিরক্ত হচ্ছিলেন। মধুরের মতলবটা যে কী ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না ; সেজন্য অস্বস্তিও বোধ করেছিলেন ভেতরে ভেতরে। রুক্ষ গলায় বলেছিলেন, 'আপনি ম্যাজিক দেখাতে চান নাকি ?'

মধুর দারুণ মিষ্টি করে হেসেছিল, 'একজ্যাক্টলি।' হাসির জন্য ঠোঁট ফাঁক হয়ে সাদা পোকরাজের দানার মতো দুটো ধবধবে দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল তার।

'আপনি কি ম্যাজিসিয়ান ?'

'বলতে পারেন। যে কোন যুবতী মেয়েই ম্যাজিসিয়ান।'

'সার্চের পরে ম্যাজিকটা দেখলে ভালো হত না ?'

'সারা ফ্ল্যাট লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে; তার মধ্যে ম্যাজিক দেখতে ভালো লাগবে না। মানে সব কিছুর জন্যে একটা অ্যাটমসফীয়ারের তো দরকার হয়।'

'যা ইচ্ছা হয় করুন কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী সময় পাবেন না। তারপর আমরা যে জন্যে এসেছি তা শুরু করে দেব।'

'পাঁচ মিনিট সাফিসিয়েণ্ট।' বলতে বলতেই ঘুরন্ত খাটে উঠে দাঁড়িয়েছিল মধুর। পরক্ষণে আবার বলেছিল, 'আপনি কি ম্যারেড ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'অবশ্যই।'

'ফাইন। তা হলে একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করতে পারবেন।'

'কিসের ?'

'দেখুন না; অত ইমপেশেণ্ট কেন ?' বলেই কোমর থেকে ম্যাক্সির বেল্টটা খুলে ফেলেছিল মধুর। তারপর পট পট করে বোতামগুলো খুলে পুরো ম্যাক্সিটা গা থেকে খসিয়ে একধারে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ভেতরে তখন একটা প্যাণ্টি আর কালো ব্রা ছাড়া কিছুই ছিল না।

খাটটা ঘুরে যাচ্ছিল; ফলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সুশোভনকে দেখছিল মধুর। দেখতে দেখতেই ঝট করে প্যাণ্টি আর ব্রা খুলে ফেলেছিল। সে দুটোর তলায় ছিল সরু বিকিনি আর সরু একফালি ব্রা।

মধুরকে এ ভাবে নিয়ে খাটটা কতক্ষণ ঘুরে গিয়েছিল মনে নেই। হঠাৎ একসময় চমকে উঠে সুশোভন দেখেছিলেন, গা থেকে সরু ব্রা আর বিকিনিটা খুলে ফেলেছে মধুর।

স্ট্রিপ টীজ কথাটা জানা ছিল সুশোভনের; কখনও ছাখেন নি। জীবনে সেই প্রথম দেখেছিলেন।

মধুরের শরীরে একটি সুতোও তখন নেই। ব্রোঞ্জের স্তম্ভের মতো দুই উরু, মোমে মাজা মসৃণ পা, কোমরের নিচের বিপজ্জনক অংশ, গোলাপের পাপড়ির মতো তলপেট, বুকের দুই সোনার পাহাড়, সুগভীর নাভি, ওলটানো তানপুরার মতো পেছন দিক—সব তখন উন্মুক্ত।

রিভলভিং খাটটা আগুনের একটা হল্কাকে নিয়ে ঘুরেই যাচ্ছিল, ঘুরেই যাচ্ছিল। রেডিওগ্রামে সেই উত্তেজক বাজনাটা বেজেই যাচ্ছিল, বেজেই যাচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল মধুর। তার চোখ তখন ঢুলু-ঢুলু; কিন্তু তাতে শাণিত ছুরির ধার। চাপা শিসের মতো শব্দ করে সে বলেছিল, 'ম্যাজিকটা কিরকম দেখছেন অফিসার?'

সুশোভন বিবাহিত; মেয়ে-শরীর তাঁর কাছে কোন অজানা ব্যাপার নয়। কিন্তু এত তীব্র আকর্ষণীয় দেহ আর কখনও ছাখেন নি। তার রক্তস্রোতে ঝড় ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। স্নায়ুগুলো ঝিম ঝিম করছিল আর প্রচণ্ড নেশাগ্রস্তের মতো মাথাটা টলছিল।

মধুর আবার বলছিল, 'এবার বলুন কে বেশি সুন্দর—আপনার স্ত্রী না আমি?'

সুশোভন উত্তর ছান নি।

মধুর সমানে বলে যাচ্ছিল, 'এমন একটা ম্যাজিক দেখালাম; আপনি চাইলে দুজনে মিলে আমরা ম্যাজিক করতে পারি। এখন বলুন এমন চার্মিং একটা ম্যাজিকের জন্যে কিছু পুরস্কার পাব না?'

'কী পুরস্কার চান?'

'আপনারা সার্চ করবেন না—এই পুরস্কার।'

চেতনার শেষ অন্তরীপটা ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সজাগ হয়ে গিয়েছিল সুশোভনের। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তারপর গলায় সবটুকু শক্তি জড়ো করে চিৎকার করেছিলেন, 'ঘোষ, চাকলাদার—তোমরা এক্ষুনি এ ঘরে চলে এসো।'

পুরো স্কোয়াডটাই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দৌড়ে এসেছিল।

তারপর রিভলভিং খাটে মধুরকে ওভাবে ঘুরতে দেখে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সুশোভন গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে আবার চেঁচিয়েছিলেন, 'দাঁড়িয়ে দেখছ কি ; এক্ষুনি মহিলাকে একটা কাপড়-টাপড় দিয়ে চাপা দাও। তারপর সার্চ শুরু কর।'

একজন জুনিয়ার অফিসার এবং ফোর্থ ক্লাস স্টাফের একটি লোক তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে বেড-কভার আর জাপানী কম্বল তুলে মধুরের শরীর ঢেকে দিয়েছিল।

ওই ফ্ল্যাটটা সার্চ করে পাওয়া গিয়েছিল বিভিন্ন নামে কয়েক লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজপত্র আর কয়েকটা ব্যাঙ্কের লকারের চাবি। লকারগুলোও নানা নামে নেওয়া ছিল। সেগুলো খুলতে প্রচুর সোনা বেরিয়ে পড়েছে।

কালো টাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার চতুর্থ দিনে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল। মনে পড়ে সেদিন লাউডন স্ট্রীটের একটা স্কাই-স্ক্রেপারে স্কোয়াড নিয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে সারি সারি চারটে লিফ্‌ট বক্স। অফিসের স্টেশন ওয়াগন থেকে নেমে সুশোভন সেদিকে যাবেন, একটা অস্বাভাবিক লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার লোক দৌড়তে দৌড়তে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল, 'আপনারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে আসছেন ?'

কবে কোথায় সার্চ করতে যাওয়া হবে, আগে থেকে কারোকে বলা হয় না। এমন কি দু-একজন ছাড়া স্কোয়াডের অন্য মেম্বারদেরও জানানো হত না। তার মানে এই নয় তারা বিশ্বাসের অযোগ্য। আসলে অসাবধানে কারো মুখ ফসকে কথাটা জানাজানি হয়ে যায় সেই জন্য এই গোপনতা বা সতর্কতা। কিন্তু সেই সিড়িঙ্গে লোকটা কি করে জেনে ফেলেছিল কে জানে।

সুশোভন কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তবে সন্দিগ্ধভাবে লোকটাকে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'আপনার তাতে দরকার ?'

'আছে দরকার। আপনারা যদি ইনকাম ট্যাক্সের লোক হন একটা দুর্দান্ত খবর দিতে পারি।'

'ধরুন আমরা ইনকাম ট্যাক্সেরই লোক। খবরটা কী?'

'তার আগে বলুন আপনারা অর্জুন সচদেবের ফ্ল্যাট সার্চ করতে এসেছেন কি?'

ঠিকই বলেছে লোকটা। কিন্তু স্পষ্ট করে ধরা দিতে চান নি সুশোভন। বলেছিলেন, 'যদি এসেই থাকি, সো হোয়াট?'.

লোকটা বলেছিল, 'ফ্ল্যাটে খোঁজাখুঁজি করে কিচ্ছু লাভ হবে না। অর্জুন সচদেব মাল সরিয়ে ফেলেছে। তিনদিন ধরে সার্চের ভয়ে সে সহজে বাড়িতে ঢোকে না। ঢুকলেও আধ ঘণ্টার বেশি বাড়ি থাকে না।'

'যায় কোথায় লোকটা?'

'রাস্তায় রাস্তায় দিনরাত একটা ইমপোর্টেড গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গাড়িটার নাম্বার ডব্লু-বি-এন ওয়ান নট নট নট নট ফাইভ। এই গাড়িটার ওপর দয়া করে একটু নজর রাখবেন। তা হলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'ইনফরমেশনটার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা—'

লোকটা সোজাসুজি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা?'

'এই খবরটা যে দিলেন, এতে আপনার কী লাভ?'

'ব্যক্তিগত লাভ আর কী। একজন সু-নাগরিক হিসেবে জাতিকে সাহায্য করা আমার উচিত কিনা আপনিই বলুন।'

'অবশ্যই। খবরটার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

লোকটা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, 'তবে অন্য একটা ব্যাপারও আছে।'

সুশোভন জানতে চেয়েছিলেন, 'কী ব্যাপার?'

'আমি অর্জুন সচদেবের কাছে কাজ করতাম। শালা শুয়ারের

বাচ্চাটা সামান্য হিসেবের গরমিলের জন্যে জুতোপেটা করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; তার রিভেঞ্জটা তো নেওয়া দরকার।' বলেই লোকটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সতিসত্যিই অর্জুন সচদেবের ফ্ল্যাট সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায় নি ; এমন কি তাকেও না। অর্জুনের স্ত্রীকে অর্জুনের খবর জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, তার স্বামী ক'দিন ধরে বাইরে গেছে। কবে ফিরবে সে জানে না। বোঝা গিয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটাই শেখানো পড়ানো।

অতএব সেই সিড়িঙ্গে লোকটা যে ইমপোর্টেড গাড়িটার নম্বর দিয়েছে সেটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সুশোভনের। অর্জুন সচদেবের ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে আণ্ডার গ্রাউণ্ড গ্যারেজে তিনি গাড়িটার খোঁজ করেছিলেন। কেয়ারটেকার জানিয়েছিল ঘণ্টাত্বয়েক আগে সচদেব সাহেব গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এর পর নিজের স্কোয়াডের সঙ্গে আলোচনা করে সুশোভন ঠিক করেছিলেন সচদেবদের সেই মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটা থেকে একটু দূরে একটু আড়াল মতো জায়গা খুঁজে সচদেবের জন্য অপেক্ষা করবেন। সিড়িঙ্গে লোকটা খবর দিয়েছিল, সারা দিনে একবার না একবার সে বাড়ি ফেরে। যতক্ষণ না অর্জুন ফিরছে তাঁরা এখান থেকে যাবেন না।

সচদেবের বিশাল বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা গলির মুখে স্টেশন ওয়াগন দাঁড় করিয়ে প্রতীক্ষা শুরু হয়েছিল।

ঘণ্টাতিনেক মেরুদণ্ড টান করে বসে থাকার পর ডব্লু-বি-এন ওয়ান নট নট নট নট ফাইভ নম্বরের দামী জাপানী গাড়িটা দেখা গিয়েছিল। অর্জুন সচদেব বাইরের রাস্তা থেকে তাদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে গাড়িটা ঘোরাতে যাবে সেই সময় স্টেশন ওয়াগনটা গলির মুখ থেকে বার করে সুশোভনরা ছুটে গিয়েছিলেন।

অর্জুনের স্নায়ুগুলো কুকুরের মতো সজাগ। দ্রুত একবার পেছন ফিরেই সে টের পেয়ে গিয়েছিল, তার জন্য জাল পাতা হয়েছে।

গাড়িটা ভেতরে না ঢুকিয়ে সে ঝড়ের বেগে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চালিয়ে দিয়েছিল।

সুশোভন চিৎকার করে বলেছিলেন, 'ফলো—'

তারপর গোটা কলকাতা অর্জুন সচদেবের ইমপোর্টেড জাপানী গাড়িটার পেছন পেছন সুশোভনরা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি করেছেন। মাঝে মাঝে একেকটা ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের কাছে এসে গাড়ি থেমে যায়; সুশোভনরা নেমে অর্জুনকে ধরতে যাবার আগেই গ্রীন সিগন্যাল জ্বলে ওঠে। ধরা আর হয় না। একটা পিছল মাছের মতো হাতের মুঠো থেকে সে বার বার বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ঘণ্টাদুয়েক আঠার মতো লেগে থাকার পর অর্জুন যখন ধরা পড়ে পড়ে সেই সময় সে একটা দারুণ বেপরোয়া কাণ্ড করে বসেছিল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আরেক হাতে জানলা দিয়ে গোছা গোছা নোট ছুঁড়তে শুরু করেছিল।

দৃশ্যটা দেখবার মতো। আচমকা রাস্তায় টাকার বৃষ্টি হচ্ছে; হাওয়ায় হাজার হাজার নোট উড়েছে। প্রথমটা চারদিকের লোকজন হকচকিয়ে গিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে কিনা তারা বুঝতে পারছিল না। তারপরেই চারদিক থেকে অগুনতি মানুষ উন্মাদের মতো নোট কুড়োবার জন্য দৌড়ে এসেছিল। রাস্তায় যারা হেঁটে যাচ্ছিল তারা তো ছিলই, এমন কি বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি-রিকশা সব থামিয়ে পিল পিল করে গাদা গাদা মানুষ নেমে এসেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি এবং চিৎকার। এদিকে গাড়িটাড়ি থেমে চারদিকে জট পাকিয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জায়গাটার চেহারা পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্রের মতো হয়ে গিয়েছিল।

এরই ফাঁক-ফোঁক দিয়ে ইঁদুরের মতো পথ কেটে কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল অর্জুন সচদেব, কিন্তু ঢাউস স্টেশন ওয়াগন নিয়ে মাকড়সার জালে মাছি পড়ার মতো আটকে গিয়েছিলেন সুশোভনরা।

ঘণ্টাখানেক বাদে পুলিশ এসে গাড়ির জট ছাড়িয়ে দেবার পর

সুশোভনরা বেরুতে পেরেছিলেন কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মনে পড়ে সেদিন রাত্রেই অর্জুন সচদেব্‌কে ধরা গিয়েছিল কিন্তু কোন লাভ হয় নি। একটা কালো টাকাও পাওয়া যায় নি।

পরের দিনের ঘটনাটাও দারুণ ইন্টারেস্টিং। সেদিন বিকেলে থিয়েটার রোডের বিরাট কম্পাউণ্ডওলা একটা চমৎকার দোতলা বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন সুশোভনরা। বাড়িতে ছিলেন মধ্যবয়সী সুপুরুষ এক ভদ্রলোক—মিস্টার রাজেশ মালিক এবং তাঁর আমেরিকান স্ত্রী মিসেস আগনীস মালিক। বাড়িটা ওদেরই।

মিস্টার এবং মিসেস মালিক সুশোভনদের খুব খাতির-টাতির করে বসিয়েছিল। হট বা সফট বিভারেজ অফার করেছিল। সুশোভন সবিনয়ে সে সব ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে বলেছিলেন, 'আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা কো-অপারেট করবেন।'

রাজেশ এবং আগনীস মালিক অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। তারপর বলেছে, 'আমার বাড়িতে ব্ল্যাক মানি আছে, এ খবরটা আপনাদের কে দিল!'

'যে-ই দিক, তার নাম বলা হবে না। ইনফরমেশনের সোর্স আমরা ডিসক্লোজ করি না।'

রাজেশ মালিক বলেছিল, 'কিন্তু অফিসার, আপনি বিশ্বাস করুন আমার বাড়িতে কালো টাকা নেই; নট এ সিঙ্গল ব্ল্যাক চিপ।'

আগনীস মালিক বলেছিল, 'উই আর হানড্রেড পারসেন্ট ন্যাশনালিস্ট। ইন ওয়ান সেন্স প্যাট্রিয়টও বলতে পারেন। নেশানের কোন ক্ষতি হয়, ন্যাশনাল ইকনমি প্যারালাইজড হয়, এরকম কোন কিছু করা দূরের কথা, কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না।'

কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল রাজেশ এবং আগনীস মালিক যেন স্বর্গের দেবদূত আর দেবদূতী। কিন্তু ততদিনে অত্যন্ত কড়া এবং টাফ

অফিসার হয়ে উঠেছেন সুশোভন। ভালো ভালো কথা বা মিষ্টি হাসি দিয়ে তাঁকে গলানো তখন অসম্ভব। তিনি বলেছিলেন, 'দ্যাটস নাইস। তবু সার্চটা আমাকে করতেই হবে। আমার ওপর সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অবশ্য—'

রাজেশ মালিক জিজ্ঞেস করেছিল, 'অবশ্য কী?'

'আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্ল্যাক মানি বার করে দেন সার্চ করব না।'

'বার বার ব্ল্যাক মানি বলছেন কেন? টাকা কখনও কালো হয়? সব টাকাই ভালো টাকা, সাদা টাকা—অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক। টাকাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করার কোন মানে হয় না।'

'তা হলে গোপন টাকাকে কী টাকা বলব?'

'আন-অ্যাকাউণ্টেড টাকা বলতে পারেন।'

'তার মানে হিসেবের বাইরের টাকা ; এই তো?'

'একজাক্টলি।'

'ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই। গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক, গন্ধ একই থাকবে। প্লীজ আপনার অ্যান-অ্যাকাউণ্টেড মানিই বার করে দিন।'

রাজেশ মালিক বলেছিল, 'আরে মশাই নামকরণে আমার আপত্তি ছিল। তাই বলে আপনি ধরে নিলেন আমার বাড়িতে আন-অ্যাকাউণ্টেড মানি আছে!'

আগনীস মালিক বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

রাজেশ এবং আগনীসকে দেখতে দেখতে সুশোভন বলেছিলেন, 'তা হলে আপনারা নিজের থেকে বার করে দেবেন না?'

রাজেশের মুখচোখের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে তীক্ষ্ণ গলায় সে বলেছিল, 'হোয়াট ডু ইউ মীন? আমার আন-অ্যাকাউণ্টেড টাকা যদি থেকেই থাকে, আপনার ধারণা আমি সেটা বার করে দেব? বার করে দেবার জন্যে সেটা লুকিয়ে রেখেছি! ইউ আর এ ফুল-ব্লাডেড ডাফার।' একটু থেমে বলেছিল, 'সার্চ আটকাতে

পারব না ; তবে কো-অপারেটও করব না। যদি বার করে নিন।'

পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল রাজেশ। সুশোভনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন, 'অল রাইট—' বলেই স্কোয়াডের লোকজনদের দিকে ফিরেছিলেন, 'কাম অন—'

ঘণ্টা তিন চারেক গোটা বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর, ছাদ, বাথরুম, কিচেন, সারভেন্টস কোয়ার্টার, গ্যারেজ, সামনের দিকের লন, পেছন দিকের বাগান তোলপাড় করে খোঁজা হয়েছিল। এমন কি বাথরুমের সিলিং ভেঙে মেঝের টাইলস উল্টে দেখা হয়েছিল। কিন্তু কোথাও কিচ্ছু নেই।

খোঁজাখুঁজির পর আবার ড্রইং রুমে ফিরে এসেছিলেন সুশোভনরা। এই ঘরটাই শুধু ভালো করে খোঁজা তখনও বাকি।

যতক্ষণ সার্চ চলেছে রাজেশ এবং আগনীস মালিক তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছে আর নাক কুঁচকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছে, 'শুধু শুধুই খাটলেন অফিসার। মাঝখান থেকে আমার বাথরুমটা ড্যামেজ করে দিয়ে গেলেন। ফরেন থেকে টাইলস এনে বসিয়েছিলাম ; এখন কি আর একজাক্ট ঐরকম টাইলস পাওয়া যাবে।'

সুশোভন উত্তর ছান নি।

যাই হোক ড্রইং রুমে এসে রাজেশ বলেছিল, 'এটাই আপনার লাস্ট ঘর তো ?'

সুশোভন বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'প্লীজ ডু হোয়াট-এভার ইউ লাইক, বাট ডু ইট কুইক। আমি একজন রেগুলার ট্যাক্স-পেয়ার, রেসপনসিবল এস্টাব্লিশড ম্যান। তিন ঘণ্টা আমাকে হ্যারাস করেছেন। আমাদের স্নান-খাওয়া কিচ্ছু হয় নি। আশা করি, তাড়াতাড়ি আপনি আমাদের রিলিজ করে দেবেন।'

সুশোভন কোন কথা না বলে চারদিকের দেয়াল, সোফা, সেণ্টার টেবল, বড় শেডওয়ালা ফ্যাশনেবল লাইটস্ট্যাণ্ড লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছিল একটা ডিসটেম্পার-করা ঝকঝকে দেয়ালে

অফিসার হয়ে উঠেনের দাগ। এরকম সুন্দর দেয়ালে দাগটা অদ্ভুত বেখাপ্পা। আঁকে গলানো মনে হয়েছিল, ওখানে একটা গর্ত-টর্ত আছে। চুন দিয়ে সেটা বোজানো হয়েছে। তক্ষুনি সুশোভন কিছু বলেন নি। দু-তিন ঘণ্টা একটানা সার্চের পর ভয়ানক ক্লান্তি লাগছিল; চুনের দাগটার দিকে চোখ রেখে তিনি একটা সোফায় বসে পড়েছিলেন। দেখাদেখি অন্যরাও বসেছিল। রাজেশ এবং আগনীস মালিক বসেছিল সুশোভনের মুখোমুখি।

রাজেশ অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে এবার বলেছিল, 'আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে, আর ভয়ানক হতাশও। একটু ব্র্যাণ্ডি দেব; কয়েক মিনিটের মধ্যে এনার্জি ফিরে পাবেন।'

ব্যঙ্গটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি সুশোভনের। বলেছিলেন, 'নো, থ্যাঙ্কস। আমি ড্রিঙ্ক করি না।'

'ব্র্যাণ্ডিতে অ্যালকোহলের পারসেণ্টেজ খুব সামান্য। ওটা মশাই মেডিসিন।'

'হতে পারে, আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

সেণ্টার টেবলে নানারকম জিনিস সাজানো ছিল। যেমন জাপানী পুতুল, ত্রিপুরা হ্যাণ্ডিক্রাফটের কিছু কাজ, হায়দ্রাবাদী অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা বলতে বলতে জিনিসগুলো অন্যমনস্কের মতো নাড়া-চাড়া করছিলেন সুশোভন। হঠাৎ হাতে লম্বাটে পেরেকের মতো কিছু ঠেকতে তিনি তুলে নিয়েছিলেন। জিনিসটা খুবই চকচকে; খানিকটা চাবির মতো দেখতে। সেণ্টার টেবলের সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলোর মধ্যে এরকম একটা চাবি কেমন যেন মানাচ্ছিল না। হাতের তালুতে সেটা নাচাতে নাচাতে সুশোভন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এটা কী মিস্টার মালিক?'

রাজেশ মালিকের চোখ মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে খুব স্বাভাবিক গলায় সে বলেছিল, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন ওটা একটা স্টীলের পেরেক—'

'আপনার এত বিউটিফুল ড্রইংরুমে এটা এল কি করে?'

'তা কি করে বলব।' বেয়ারা-টেয়ারা কেউ হয়ত রেখেছে।'

হঠাৎ সুশোভনের মাথার ভেতর দিয়ে উল্কা ছুটে গিয়েছিল যেন। দেয়ালের সেই চুনের দাগটা দেখতে দেখতে রাজেশকে বলেছিলেন, 'মিস্টার মালিক আপনার বেয়ারাদের ডিসমিস করে দেওয়া উচিত।'

রাজেশ মালিক চোখ কুঁচকে বলেছিল, 'মানে—'

'আপনি এত ফাইন টেস্টের লোক। অথচ দেখুন কেউ বাজে পেরেক এনে সেণ্টার টেবলে রাখছে, আবার কেউ চমৎকার দেয়ালে চুন মুছে রাখছে। বেয়ারারা ছাড়া এ কাজ কে করবে বলুন—'

'চুন!' রাজেশ চমকে উঠেছিল, 'কোথায়?'

সুশোভন চুনের দাগটা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ঐ যে—'

রাজেশ বলেছিল, 'আরে তাই তো! ওখানে দাগটা করল কে?'

ততক্ষণে সুশোভন উঠে দাগটার কাছে চলে এসেছেন। রাজেশ এবং আগনীস মালিকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছিল।

সোজা রাজেশের চোখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন বলেছিলেন, 'এরকম একটা দেয়াল ড্যামেজ করার কোন মানে হয়!'

রাজেশ বলেছিল, 'কি আর করা যাবে, পুরো দেয়ালটাকে চেঁচে ফেলে আরেক বার ডিসটেম্পার করিয়ে নিতে হবে। অনেকগুলো টাকা খরচ হবে আবার। চলুন অফিসার বসা যাক।'

সুশোভন তার কথা যেন শুনতে পান নি। একটু অন্যমনস্কের মতো বলেছিলেন, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, এখানে কেউ একটা গর্ত-টর্ত করে চুন দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছে।'

সুশোভন লক্ষ্য করেছিলেন, রাজেশের চোখের নীলচে তারা একেবারে স্থির হয়ে গেছে। তার কপালের দুপাশে দুটো মোটা রগ ঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করেছিল। ঘাড়ের কাছে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরিয়েছিল। সুশোভনও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন; তাঁর চোয়াল ক্রমশ পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠছিল। বোঝা যাচ্ছিল দুজনের স্নায়ুতে সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড কোল্ড ওয়ার চলছে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ স্নায়ুযুদ্ধের পর রাজেশ জোরে নিঃশ্বাস ফেলে-

ছিল। তারপর হেসে হেসে বলেছিল, 'একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন অফিসার। অনেক দেরি হয়ে গেছে; আপনার সার্চ শেষ করে ফেলুন।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। এই চুনের দাগধরা জায়গাটা একটু ভালো করে দেখি। তা হলেই সার্চ শেষ হয়ে যাবে।' বলেই দেয়ালের দিকে ফিরেছিলেন। হাতে চাবির মতো সেই পেরেকটা ছিল। সেটা দিয়ে অল্প খোঁচা দিতেই যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তা-ই, একটা গর্ত বেরিয়ে পড়েছিল। কি আশ্চর্য, গর্তটার মাপ অবিকল চাবিটার মাপেই যেন তৈরি।

চাবিটা গর্তে ঢুকিয়ে ওপরে-নিচে এবং ডাইনে-বাঁয়ে বারকয়েক চাপ দিতেই দেয়াল দু-ভাগ হয়ে সরে গিয়েছিল। একেবারে আরব্য রজনীর সেই আলিবাবার গল্পের মতো ব্যাপার। দেয়াল সরে যেতেই সিঁড়ি দেখা গিয়েছিল। সুশোভন রাজেশ এবং আগনীস মালিককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উত্তেজিত স্বরে তাঁর স্কোয়াডকে বলেছিলেন, 'হারি আপ; ভেতরে গিয়ে দেখ—'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতর থেকে তাঁর স্কোয়াডের লোকেরা আট-দশটা স্টীলের বাক্স নিয়ে এসেছিল। সেগুলো থাক থাক কারেন্সি নোট আর সোনার বিস্কুটে বোঝাই।

সুশোভন সেই চাবিটা চুলের ভেতর চালাতে চালাতে রাজেশকে বলেছিলেন, 'চ্যালেঞ্জের জন্যে ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়ই এবার স্বীকার করবেন আপনার আন-অ্যাকাউন্টেড মানি আমি খুঁজে বার করতে পেরেছি।'

দেখতে দেখতে সাত-আটটা দিন কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে সীতা উদ্ধারের মতো ব্ল্যাক মানি উদ্ধারের ফাঁকে ফাঁকে রোজই একবার করে ক্যান্সার হাসপাতালে গিয়ে পরমাকে দেখে এসেছেন সুশোভন। এই সাত-আটদিন ধরে পরমার নানারকম পরীক্ষাও চলেছিল; সেই সঙ্গে বায়োপ্সিও।

মনে পড়ে ঠিক আটদিনের মাথায় বায়োপ্সির রিপোর্টটা বেরিয়েছিল। বরানগরের ডক্টর সেন এবং পার্ক স্ট্রীটের ই-এন-টি স্পেশালিস্ট যা সন্দেহ করেছিলেন, দেখা গিয়েছিল তা-ই। বায়োপ্সি রিপোর্টে নির্ভুলভাবে ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

রিপোর্টটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সুশোভন বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। পৃথিবীতে এত অজস্র বাতাস, এত প্রচুর অক্সিজেন, তবু তাঁর মনে হয়েছিল শ্বাস নেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে হয়েছিল, হাত-পায়ের জোড় ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে; তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। চোখের সামনের সমস্ত দৃশ্যাবলী—হাসপাতাল বিল্ডিং, ডাক্তার এবং নার্সদের ব্যস্ত ছোটাছুটি, সামনের বড় রাস্তায় গাড়ির স্রোত, মানুষের ভিড়—সব কিছু দ্রুত ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ে বায়োপ্সি রিপোর্টটা নিয়ে সেদিনই ক্যান্সার হাসপাতালের স্পেশালিস্টরা একটা মেডিক্যাল কনফারেন্স বসিয়েছিলেন। কনফারেন্সের পর সুশোভনকে জানানো হয়েছিল পরমার জন্য দুটো অলটারনেটিভ রয়েছে। হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গলায় অপারেশন করাতে হবে। তা না হলে নিয়মিত প্রতি মাসে একবার করে হাসপাতালে এসে গলায় 'রে' নিতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য ওষুধ তো আছেই। তবে অপারেশন হোক বা না হোক, জীবন সম্বন্ধে কোন গ্যারান্টিই দিতে পারেন নি স্পেশালিস্টরা। তাঁদের মতে পরমার আয়ু আর বেশি নেই; বড় জোর ছ' মাস থেকে ন' মাস।

সুশোভন ঠিক করেছিলেন, অপারেশন করাবেন না। জীবন সম্পর্কেই যখন নিশ্চয়তা নেই তখন আর কাটা-ছেঁড়ার কোন মানে হয় না। সেদিনই তিনি পরমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

চাকরিতে বিরাট প্রোমোশন পেয়েছেন, কাজের দায়িত্ব দশগুণ বেড়ে গেছে, কালো টাকার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটা অভিযানে তিনি দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সে জন্য হায়ার অথরিটির কাছে তাঁর প্রচুর সুনাম হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই ভালো লাগছিল না। মনে হয়েছিল তেজী

ঘোড়ার মতো দৌড়তে দৌড়তে আচমকা হুড়মুড় করে ঘাড় ভে
তিনি পড়ে গেছেন। তাঁর কাছে জীবনের সব স্বাদ-গন্ধ একেবারে ন
হয়ে গিয়েছিল।

বেঁচে থাকাটা যত কষ্টকর আর অর্থহীনই মনে হোক, পরের দি
যথারীতি অফিসে আসতে হয়েছিল সুশোভনকে। তখনও ঘাট-সত্ত
জায়গায় কালো টাকার খোঁজে হানা দেওয়া বাকি।

সুশোভন সেদিনের প্রোগ্রাম আর স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে তাঁ
স্কোয়াড নিয়ে বেরুতে যাবেন, মানেকলাল মেহতার ফোন এসেছিল
সে বলেছিল, 'অনেকদিন পর আবার আপনাকে ফোন করলা
স্যার—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'নতুন কিছু বলার আছে ?'

'আছে স্যার—'

'তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন ; আমি খুব ব্যস্ত আছি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বলছি। শুনলাম আপনার স্ত্রী খুবই অসুস্থ ; তাঁর ক্যান্সা
হয়েছে। শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। কী বলে যে আপনা
সহানুভূতি জানাবো বুঝতে পারছি না।'

খুবই আন্তরিক গলায় সহানুভূতির কথাটা বলেছিল মানেকলাল
অন্তত তা-ই মনে হয়েছিল সুশোভনের। লোকটা ভয়ানক বা
টাইপের। তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত চে
করে যাচ্ছিল। তবু সেই মুহূর্তে তাকে ভালো লেগেছিল সুশোভনের
তিনি বলেছিলেন, 'আপনার সিমপ্যাথির জন্যে ধন্যবাদ।'

'ডাক্তাররা কী বলছে ?'

পরমার আয়ু আর কতদিন আছে, সেটা বাদ দিয়ে স্পেশালিস্টদে
বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছিলেন সুশোভন।

মানেকলাল বলেছিল, 'যদি কিছু মনে না করেন আমার একটা
সাজেশান শুনবেন—'

সুশোভন আগ্রহের সুরে বলেছিলেন, 'কী সাজেশান ?'

'আপনি মিসেস ব্যানার্জিকে নিয়ে জাপান কি আমেরিকা

আমেরিকায় চলে যান। ওদের দেশে ক্যান্সার নিয়ে অ্যাডভান্সড রিসার্চ চলছে। আমার মনে হয় ফরেনে নিয়ে গেলে হয়ত কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এই কথাটা সুশোভন নিজেও অনেকবার ভেবেছেন। তাঁর ভাবনার সঙ্গে মানেকলালের কথা মিলে যাচ্ছে দেখে ভালো লেগেছিল। বলেছিলেন, 'যাব তো। কিন্তু—'

ফোনের মাউথপীসে মুখটা ঢুকিয়েই যেন মানেকলাল জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু কী?'

'ফরেনে যে যাব, তার অ্যারেঞ্জমেণ্ট কী করে হবে? অত টাকাই বা কোথায় পাব?'

'স্যার, আপনি যদি সাহস দেন একটা কথা বলি।'

'বলুন—'

'চার-পাঁচ বছর ধরে আপনার গায়ে আমি আঠার মতো আটকে আছি কিন্তু আপনি কোনদিনই আমাকে বন্ধু বলে ভাবলেন না। প্লীজ টেক মী ফর এ ফ্রেণ্ড।'

সুশোভন উত্তর দেন নি।

মানেকলাল আবার বলেছিল, 'আপনি স্যার ফরেনে যাবার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। পাসপোর্ট ভিসা থেকে শুরু করে বিদেশে মিসেস ব্যানার্জির জন্যে হসপিটাল সীট আর আপনার জন্যে হোটেলের অ্যারেঞ্জমেণ্ট পর্যন্ত সব দায়িত্ব আমার।'

বিমূঢ়ের মতো সুশোভন প্রতিধ্বনি করেছিলেন, 'সব দায়িত্ব আপনার!'

'ইয়েস স্যার। এমন কি গাড়ি করে এয়ারপোর্টেও আপনাদের পৌঁছে দেব। আপনারা শুধু একটু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে প্লেনে উঠবেন। আপনি যদি চান এক মাসের ভেতর আপনারা দুজন আমেরিকা হোক, জাপান হোক আর সুইজারল্যাণ্ডই হোক—এনিহোয়্যার ইন দি ওয়ার্ল্ড চলে যেতে পারবেন।' বলতে বলতে গলার স্বরটা ঝপ করে খাদে নামিয়ে দিয়েছিল, 'স্যার আপনি যদি আদেশ করেন

আমি এ ব্যাপারে তা হলে আজ থেকেই অ্যারেঞ্জমেণ্ট শুরু করে দিই।'

এতক্ষণ পরমা এবং তার ক্যান্সার ছাড়া অন্য কিছুই ভাবেন নি সুশোভন। অনেকটা ঝোঁকের মাথায় আর অদ্ভুত এক মানসিক আবেগের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি। এবার যেন কিছুটা সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন এবং সন্দিগ্ধও। বলেছিলেন, 'মিস্টার মেহতা, আপনি যে আমার জন্যে এত কিছু করতে চাইছেন, এটা কি শুধুই নিঃস্বার্থ পরোপকার?'

মানেকলাল বলেছিল, 'নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে পৃথিবীতে কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন?'

'তা হলে—'

'স্যার, আপনি তো জানেনই এই রুড রাফ ওয়ার্ল্ডে কোন কিছুই খালি হাতে পাওয়া যায় না। আমি তো সুপারম্যান নই, ডিভাইন সোলও না। আমি বুঝি 'ইউ গিভ মী সামথিং অ্যাণ্ড আই গিভ ইউ সামথিং।' এটাই রেসপেক্টিবল টার্ম।' এক দমে কথাগুলো বলে শব্দ করে একটু হেসেছিল মানেকলাল। পরক্ষণে আবার শুরু করেছিল, 'নইলে আপনি শুধু দেবেন আর আমি শুধু নিয়ে যাব কিংবা আমি দেব আর আপনি শুধু নিয়ে যাবেন, এতে রিলেশান থাকে না। আপনি স্যার আমাকে কিছু দিন, আমিও আপনাকে কিছু দিই। দেখবেন বন্ধুত্বের ফাউণ্ডেসন কংক্রীটের মতো শক্ত হয়ে গেছে।'

'তার মানে আপনার সেই প্রোপোজালটা এখনও স্ট্যাণ্ডিং রয়েছে?'

'একজ্যাক্টলি। আমি স্যার লক্ষ্য রাখছি পার্ক স্ট্রীটের সাউথে অনেক পশ ফ্ল্যাটে আর বাংলোতে আপনি এর মধ্যেই অনেকবার 'রেইড' করেছেন।'

শরীরের পেশীগুলো কিসের একটা সংকেতে এবার শক্ত হয়ে উঠেছিল সুশোভনের। রুক্ষ চাপা গলায় তিনি বলেছিলেন, 'সো হোয়াট?'

'ওধারে আমার কিছু ক্লায়েন্ট রয়েছে। বুঝতেই পারছেন এ ব্যাপারে আমার ক্লায়েন্টরা এবং আমি খুবই অ্যাঙ্কসাস।'

মানেকলাল লোকটা কি আশ্চর্য চতুর! সহানুভূতি দিয়ে শুরু করে কি রকম আস্তে আস্তে আর দারুণ কৌশলে সে তাঁকে ফাঁসের ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল! সুশোভন বলেছিলেন, 'আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে?'

মানেকলাল যেন ব্যস্তভাবে ফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, 'আরে না না।'

'তবে চটপট সেরে ফেলুন।'

'স্যার ক'টা নাম বলব। আপনি যাদের ওপর 'রেইড' চালাবেন, কাইণ্ডলি দেখুন তো সেই লিস্টে এই নামগুলো আছে কিনা?' বলেই চোদ্দ-পনেরটা নাম গড়গড়িয়ে নামতা পড়ার মতো আউড়ে গিয়েছিল মানেকলাল।

সুশোভন বুঝতে পেরেছিলেন হাজারটা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেও যে সব নামের তালিকা তিনি তৈরি করেছেন সেটা জানতে পারে নি মানেকলাল। তবে যে নামাবলী সে আউড়ে গেছে তার সবগুলোই সুশোভনের লিস্টে ছিল। কর্কশ গলায় তিনি এবার বলেছিলেন, 'নামগুলো থাকলেও আপনাকে বলব মনে করেন?'

'বলতে হবে না। আমার ধারণা ঐ নামগুলো লিস্টে আছেই। কাইণ্ডলি ওদের ওপর 'রেইড' চালাবেন না; আমার অনুরোধ ওদের এগেনস্টে যদি কিছু ডকুমেন্ট বা পেপার-টেপার পেয়ে থাকেন নষ্ট করে ফেলুন।'

সুশোভনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন, 'আপনার কথায়?'

আশ্চর্য শান্ত গলায় মানেকলাল বলেছিল, 'না, আপনার নিজের ইন্টারেস্টে।'

গলার শির ছিঁড়ে সুশোভন আবার চেঁচিয়েছিলেন, 'হোয়াট! ইউ —ড্যাম স্কাউণ্ড্রেল, কার সঙ্গে কী কথা বলতে হয় জানো না।'

মানেকলাল বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয় নি। নিজেকে আরো শান্ত এবং সংযত রেখে অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিল, 'ঠাণ্ডা মাথায় একটা কথা ভেবে দেখুন স্যার। একটু আগে আপনার আর মিসেস ব্যানার্জির ফরেনে যাবার কথা বললাম না? তার টাকা আর বাইরে থাকার খাবার সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট লিস্টের ওই লোকগুলো করে দেবে। ওরা যদি কিছু দেয়, ইন রিটার্ন কিছু তো প্রত্যাশা করবেই। এটা মিউচুয়াল বেনিফিটের ব্যাপার আর কি।'

দাঁতে দাঁত চেপে সুশোভন এবার বলেছিলেন, 'আমরা বাইরে যাব না। আমার স্ত্রী যদি এখানে থেকে মরে যায়—যাবে।'

'স্যার অনেস্টি ব্যাপারটা আপনার মাথায় একেবারে ফিক্সেসনের মতো আটকে গেছে। নাইনটীনথ সেঞ্চুরির এই পুরনো রদ্দি ভ্যালু-গুলোকে যখের মতো আগলে রাখার কোন মানে হয়! হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলছি স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে আসুন।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'ফর গডস সেক, ডোণ্ট ডিস্টার্ব মী এনি মোর।'

'আপনি তাহলে আমার কথা শুনবেন না?'

'আপনি কি আমার সুপ্রীম অথরিটি?'

'আমি কী, আপনি তা জানেন। অনেক আগেই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি আমি একজন মিডলম্যান; কমিশন এজেণ্ট।' বলে একটু থেমেছিল মানেকলাল। তারপর কি চিন্তা করে আবার বলেছিল, 'চার-পাঁচ বছর বন্ধুভাবে আপনাকে ভজনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই লাভ হল না দেখছি। আপনাকে শেষবার বলছি, আমি যা বললাম তা করবেন কিনা?'

'না।'

'আরেক বার ভালো করে ভেবে বলুন।'

'রি-থিঙ্কিং-এর কোন প্রয়োজন নেই।'

'এটাই আপনার শেষ কথা?'

'শেষ কথাটা আপনাকে প্রথম দিনই জানিয়ে দিয়েছিলাম মিস্টার মেহ্তা। আপনার তা মনে থাকা উচিত।'

'ঠিক আছে। আপনাকে এই আমার শেষ ফোন। একটা কথা বলে দিচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি, পরে আপনাকে আপসোস করতে হবে। বন্ধুভাবে যখন হল না তখন অন্যভাবেই আমি একটু চেষ্টা করে দেখব।'

'ডোণ্ট থ্রেটেন মী।'

নাকের ভেতর অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করে মানেকলাল বলেছিল, 'গুড বাই—'

সুশোভন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঝড়াং করে ফোনটা ক্রেডলে রেখে স্কোয়াড নিয়ে তিনি পার্ক স্ট্রীটের দিকে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

মনে পড়ে একদিকে কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান চলছিল ঠিকই। আরেক দিকে পরমার অসুস্থতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার পর স্পেশালিস্টরা যে প্রেসকৃপসান করে দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী তাকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল। মাসে একবার করে হাসপাতালে গিয়ে 'রে' নিয়ে আসছিল সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। পরমার শরীর দ্রুত ভেঙে-চুরে গিয়েছিল। রৌদ্রঝলকের মতো গায়ের রঙ জ্বলে চামড়া খসখসে হয়ে যাচ্ছিল। 'রে' নেবার জন্যই সম্ভবত গলায় কালচে একটা দাগ স্থায়ীভাবে পড়তে শুরু করেছিল। শক্ত কোন জিনিস সে খেতে পারত না। তবে সব চাইতে যেটা ভয়াবহ সেটা হল তার গলার স্বর প্রায় বুজে গিয়েছিল। কথা বলতে চেষ্টা করলে অত্যন্ত অস্পষ্ট আর দুর্বল গোঙানির মতো শব্দ বেরুত। সে জন্য সে আর কিছু বলত না। হাতেব কাছেই খাতা-পেনসিল থাকত। কিছু জানবার বা জানাবার দরকার হলে তাতে লিখে দিত পরমা। একদিন কলকাতার মিউজিক কনফারেন্সে কিংবা প্লে-ব্যাকে অথবা রেডিও-রেকর্ডে যার কণ্ঠ লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুগ্ধ করেছে একটা অসহায় বোবা পাখির মতো সে তখন দিনরাত ঘরে শুয়ে থাকত। তার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে যেত।

মনে আছে একটা করুণ মৃত্যুর ছায়া লম্বা লম্বা পা ফেলে পরমার

দিকে এগিয়ে আসছিল। প্রতিদিন সেই ছায়াটা আরো দীর্ঘ হচ্ছিল।

পরমার মৃত্যু যে অবধারিত সেটা ততদিনে বাড়ির সবাই জেনে গেছে; এমন কি পরমা নিজেও। চোখের সামনে একটি মানুষের আয়ু দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। পরিণতি জানা আছে বলেই খুব সম্ভব সুশোভন-দের বাড়িটার ওপর পাষাণভারের মতো অদ্ভুত এক বিষাদ সব সময় তখন অনড় হয়ে থাকত। সুধা, মাধুরী সব সময় পরমাকে ঘিরে থাকত। অমরেশ, সমরেশ, দিবাকর বা সুশোভন নিজে অফিসের কাজটুকু চুকিয়েই তার কাছে এসে বসতেন। পরমার মা-বাবা এবং ভাইরাও কেউ না কেউ রোজ আসত। সঙ্গ দিয়ে, নানা রকম গল্প-টল্প করে অনিবার্য মৃত্যুটাকে যতক্ষণ ভুলিয়ে রাখা যায়; যতটা সহনীয় করা যায়।

কিন্তু কিছুই ভালো লাগত না পরমার। পৃথিবীর কোন কিছু সম্বন্ধেই তার আগ্রহ ছিল না। শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। খবর-কাগজে মিউজিক কনফারেন্সের বিজ্ঞাপন দেখলেই সে সুশোভনকে লিখে জানাতো, 'আমাকে একটু নিয়ে যাবে?' মৃত্যুর আগে এটাই ছিল তার জীবনের শেষ শখ।

সুশোভন, যত কাজই থাক, মিউজিক কনফারেন্সে পরমাকে নিয়ে যেতেনই। অসুস্থতার জন্য বেশি রাত পর্যন্ত পরমাকে বাইরে থাকতে দেওয়া হত না; দু-একটা গান শুনিয়েই তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হত।

মনে আছে সেদিন কলামন্দিরে একটা ধ্রুপদী গানের আসরে পরমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সুশোভন। ডায়াসের সামনের প্রথম রো-তে ডান দিকের শেষ দুটো সীটে তাঁরা বসেছিলেন। পরমা বসেছিল একেবারে শেষ সীটটায়; তার এ-পাশে সুশোভন এবং তাঁর পাশে একটি আশ্চর্য চেহারার মেয়ে।

কত বয়স হবে তার? সাতাশ-আটাশের মতো। পানপাতার মতো মুখ, সরু সুগোল থুতনি, ঘন পালকে ঘেরা দীর্ঘ স্বচ্ছ চোখ,

পাখির ডানার মতো ভুরু। দুই ভুরুর মধ্যবর্তী অংশে মেরুন রঙের চীনা সিঁদুরের গোলাকার বড় টিপ। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের। তার চুল যেন রেশমের নরম সুতো দিয়ে তৈরি। মসৃণ গলায় শাঁখের মতো তিনটি রেখা। নাকটা ছুরির ফলার মতো নেমে এসেছে। পাতলা ঠোঁট তার, মেদহীন সরু কোমর, সোনার বাটির মতো বুক।

মেয়েটির পরনে ঘি-রঙের মাইশোর সিল্কের শাড়ি এবং একই কাপড়ের ব্লাউজ, পায়ে ঘাসের চটি। কানে দক্ষিণীদের মতো ধবধবে সাদা পাথরেব কানফুল, গলায় মুক্তোর হার, ডান হাতে সোনার কঙ্কণ, বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে ওভাল শেপের একটা বিদেশী ঘড়ি।

মেয়েটার দিকে তাকালে দু' চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। সুশোভন অবশ্য তাকে দেখছিলেন না; মেয়েটি তাঁকে এবং তাঁর কাঁধের পাশ দিয়ে মাঝেমাঝেই পরমাকে লক্ষ্য করছিল।

মনে আছে সেদিন ওড়িষী নাচের একটা অনুষ্ঠানের পর আধ-ঘণ্টার ইণ্টারভ্যাল ছিল। সেই সময় মেয়েটা হঠাৎ উঠে এসে পরমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। দুই হাত জোড় করে একটু ঝুঁকে বলেছিল, 'নমস্কার, আপনি নিশ্চয়ই পরমা দেবী?'

পরমা প্রতিনমস্কার জানিয়ে আস্তে মাথা নেড়েছিল।

মেয়েটি বলেছিল, 'আমার নাম সুচেতা—সুচেতা বসু। আমি আপনার গানের একজন ভক্ত।'

পরমা বিষণ্ণ একটু হেসেছিল।

সুচেতা এবার বলেছিল, আজকাল কোন গানের ফাংশনে আপনাকে গান গাইতে দেখি না কেন? অনেকদিন আপনার কোন রেকর্ডও বাজারে বেরোয়নি। আপনাকে কিন্তু ভীষণভাবে আমরা 'মিশ' করছি।'

পরমার চোখ আরো বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। দুটি টলটলে জলের বিন্দু চোখ থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছিল।

সুশোভন এই সময় তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'ও খুব অসুস্থ।

তাই গাইতে পারে না। গান গাওয়া ডাক্তারের বারণ। কথা বলাও।'

গভীর সহানুভূতির গলায় সুচেতা বলেছিল, 'আমি জানতাম না ; দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

'না-না, মনে করব কেন ?'

'কী হয়েছে ওঁর ? সীরিয়াস কিছু ?'

সুশোভন এবার বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, 'হ্যাঁ, একটু সীরিয়াসই। গলায় একটা ট্রাবল হয়েছে। সেই জন্যে—'

সুচেতা বলেছিল, 'ডাক্তার কবে ওঁকে গান গাইতে দেবেন ?'

দ্রুত এক পলক পরমার দিকে তাকিয়ে সুশোভন সুচেতাকে বলেছিলেন, 'একটু সময় লাগবে।'

পরমার মনের ভেতর কী প্রতিক্রিয়া চলছে বাইরে থেকে বোঝা যায় নি। তার ক্লান্ত করুণ চোখ আবার জলে ডুবে গিয়েছিল।

সুচেতা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মঞ্চ থেকে ঘোষক পরবর্তী অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে দিচ্ছিল। কাজেই সুচেতা আর দাঁড়িয়ে থাকে নি, নিজের সীটে ফিরে গিয়েছিল।

মনে আছে, এর পর থেকে যে কোন মিউজিক কনফারেন্সে গেলেই সুচেতার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। কি এক অলৌকিক যোগাযোগে দেখা যেত সুচেতার সীটটা তাঁদের ঠিক পাশেই পড়েছে।

প্রতিবারই সুচেতা বলত, 'আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

সুশোভন বলতেন, 'হ্যাঁ, খুব ভালো লাগল।'

সুচেতা বলত, 'আমারও।' তারপর পরমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করত, 'উনি এখন কেমন আছেন ?'

সুশোভন বলতেন, 'একই রকম। তেমন কোন ইমপ্রুভমেণ্ট নেই।'

সুচেতার মুখটা করুণ হয়ে যেত। একটু চুপ করে থেকে সে বলত, 'ভাববেন না, নিশ্চয়ই উনি ভালো হয়ে যাবেন।'

সুশোভন এবার আর কিছু বলতেন না।

বার বার দেখা হওয়ার জন্য সুচেতার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাই হয়ে গিয়েছিল সুশোভনদের; বিশেষ করে সুশোভনের। কেন না পরমা কথা বলতে পারত না; যা কিছু বলার সুশোভনই বলতেন। আর কে না জানে কথায় কথায় মানুষ অনেক কাছাকাছি এসে যায়।

সুচেতাকে বেশ ভালোও লেগেছিল সুশোভনের। মেয়েটার স্বভাব ভারী মিষ্টি, ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত। তার চলাফেরা, কথাবার্তা—সব কিছুর মধ্যে আভিজাত্যের মৃদু সুগন্ধ যেন মাখানো। তা ছাড়া পরমার জন্য তার সহানুভূতি, আন্তরিকতা এবং দুঃখবোধও ভালো লেগেছিল সুশোভনের। মাত্র কয়েক বার দেখার মধ্যেই সুচেতা যেন আপনজন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

আলাপ পরিচয় হলে যা হয়, সুশোভন তার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পেরেছিলেন। সুচেতা বাংলা নিয়ে এম-এ পাস করেছে, তারা থাকে আলিপুরে, বাবা ডাক্তার, তার একটি ছোট বোন আছে, সে বি-এ পড়ে, তবে ভাই নেই। একটু-আধটু গান-বাজনার চর্চা করে সুচেতা, তবে ওটা কিছু না। আসলে গান শুনতেই তার ভাল লাগে, কলকাতায় কোন মিউজিক কনফারেন্স হলে সে যাবেই যাবে. ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে পড়ে একবার রবীন্দ্র-সদনে রাশিয়ান ব্যালে দেখতে গিয়ে সুচেতা সুশোভনের আরো কাছে এসে গিয়েছিল। ব্যালের একটা অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের আগে যখন ইণ্টারভাল চলছে সেই সময় সুশোভন সুচেতাকে বলেছিলেন, 'পরমা রইল, একটু দেখবেন। আমি একটা সিগারেট খেয়ে আসি।'

সুচেতা বলেছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যান। আমি পরমাদির কাছে থাকব।' ততদিনে পরমাকে সে পরমাদি বলতে শুরু করেছে।

বাইরের লাউঞ্জে গিয়ে সবে সিগারেট ধরিয়েছেন সুশোভন, সেই সময় হঠাৎ সুচেতা তাঁর কাছে চলে এসেছিল। সুশোভন একটু অবাক হয়েই বলেছিলেন, 'এ কি, আপনি চলে এলেন!'

সুচেতা বলেছিল, 'গলাটা খসখসে লাগছে ; ভাবলাম একটা পান খেয়ে আসি। পরমাদিকে তাই বলে এসেছি।'

'পান খেতে ইচ্ছে হয়েছে, আমাকে বলেন নি কেন ? আমি নিয়ে যেতাম। দাঁড়ান, নিয়ে আসছি—'

সুশোভন ওধারের একটা পান-সিগারেটের স্টলের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, সুচেতা তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আসলে পানের জন্যে আমি বাইরে আসিনি।'

সুশোভন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'তবে !'

সুচেতা তার ঘন পালকে-ঘেরা দীর্ঘ চোখ সুশোভনের মুখের ওপর স্থির করে মৃদু হেসেছিল, 'আপনার জন্যে।'

'আমার জন্যে ! তা হলে—' এবার বিমূঢ় দেখিয়েছিল সুশোভনকে।

তাঁর মনোভাবটা চট করে বুঝে নিয়ে সুচেতা বলেছিল, 'পরমা-দিকে পানের কথা না বললে অন্য কিছু ভাবতেন। তাই—' সেই মৃদু স্নিগ্ধ হাসিটা তার মুখে লেগেই ছিল।

'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

'তেমন কিছু না। একটা কথা আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু পরমাদির সামনে জিজ্ঞেস করতে পারি না। এদিকে আপনাকে একলা কখনও পাই না। আজকে সুযোগ পেয়ে চলে এলাম।'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল সুশোভনের। সুচেতার দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী কথা ?'

'পরমাদির গলার ওই ট্রাবলটা কী জন্যে ? অসুখটা কী ?'

পরমার ক্যান্সারের কথা কাউকে বলতেন না সুশোভন। সুচেতার সঙ্গে এত বার দেখা হয়েছে ; তাকেও আগে বলেন নি। সে জানত গলার একটা কষ্টের জন্য পরমার কথা বলা বা গান গাওয়া বারণ। এই পর্যন্তই। যাই হোক পরমার অসুখের কথাটা সুচেতাকে বলা উচিত হবে কি হবে না, তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না। তখন তাঁর মনোভাব খুবই দ্বিধাগ্রস্ত।

সুচেতা বলে উঠেছিল, 'আপত্তি থাকলে বলতে হবে না।'

'না না, আপত্তি কিসের।' শেষ পর্যন্ত দ্বিধাটাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন সুশোভন। যে মেয়েটা তাদের এত কাছাকাছি এসেছে, পরমার ওপর যার এত সহানুভূতি তাকে না বলার কোন মানে হয় না। সুশোভন বলেছিলেন, 'পরমার গলায় ক্যান্সার হয়েছে।'

'ক্যান্সার!' সুচেতা শিউরে উঠেছিল, 'তাহলে কি উনি আর গাইতে পারবেন না?'

'গাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ডাক্তাররা বলেছে—'

'কী বলেছে?'

'ওর আয়ু আর বেশিদিন নেই। বড় জোর ছ' সাত মাস।' বলেই কি মনে পড়তে যেন চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে আবার বলেছিলেন, 'প্লীজ এসব নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করবেন না। বুঝতেই তো পারছেন, এতে ট্রিমেণ্ডাস মেণ্টাল রি-অ্যাকশন হয়।'

সুচেতা বলেছিল, 'এসব কথা কি আলোচনা করবার! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সুশোভন এবার উত্তর দেন নি।

সুচেতা আবার বলেছিল, 'আচ্ছা, উনি ওঁর অসুখের কথা জানেন?'

সুশোভন আবছা গলায় বলেছিলেন, 'জানে বৈকি। ক্যান্সার হসপিটালে কিছুদিন ছিল, এখনও রেগুলার 'রে' নিতে যায়। না জেনে পারে?'

একটু চুপ করে থেকে সুচেতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর আয়ুর ব্যাপারটা?'

'সেটাও এতদিনে জেনে গেছে।' সুশোভন করুণ হেসেছিলেন।

সুচেতা ভারী গলায় বলেছিল, 'কী যে বলব বুঝতে পারছি না। ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।' একটু থেমে বলেছিল, 'পরমাদির জন্যে দুঃখ হয় ঠিকই। কিন্তু—'

কিছু না বলে দু-চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছিলেন সুশোভন।

সুচেতা বলেছিল 'তার চাইতে অনেক বেশি দুঃখ হয় আপনার জন্যে।'

অবাক বিস্ময়ে সুশোভন বলেছিলেন, 'আমার জন্যে বেশি দুঃখ হয়!' কথাটা তাঁর নিজের কানেই প্রতিধ্বনির মতো শুনিয়েছিল।

সুচেতা আস্তে মাথা নেড়েছিল, 'নিশ্চয়ই। ভাবছি পরমাদির যা হবার হবে কিন্তু আপনাকে তো অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে—'

বিদ্যুৎচমকের মতো সুশোভনের মনে হয়েছিল, এই কথাটা তো কখনও তিনি ভেবে দেখেন নি। পরমা কষ্ট পাচ্ছে ঠিকই, তীব্র অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তার একেকটা দিন কেটে যাচ্ছে। তবে ডাক্তারদের ধারণা যদি সত্যি হয় তার এই যন্ত্রণা খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। হয়ত ছ' মাস, হয়ত সাত মাস, কিংবা বড় জোর আট মাস। অনিবার্য নিষ্ঠুর মৃত্যু তার সব কষ্টকে স্লেটের দাগের মতো মুছে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও সুশোভন থাকবেন। তখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ। গড়পড়তা মানুষের আয়ু যদি পঁয়ষট্টি বছর হয়, সুশোভনকে আরো একুশ বাইশ বছর বেঁচে থাকতে হবে। একা একা নিঃসঙ্গ নিরুৎসব জীবন কেমন লাগবে তাঁর? ভাবনাটা ধীরে ধীরে তাঁর বুকের গভীরে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু উদাসীন সুরে সুশোভন বলেছিলেন, 'আয়ু থাকলে বেঁচে থাকতেই হবে; আত্মহত্যা তো করতে পারব না।'

সুচেতা গভীর গলায় এবার বলেছিল, 'আই ফীল ফর ইউ।' বলে আর দাঁড়ায়নি; সোজা পান-সিগারেটের স্টলটায় চলে গেছে। সেখান থেকে দ্রুত একটা পান কিনে কোনদিকে না তাকিয়ে আবাব হলে ফিরে গিয়েছিল।

সুশোভন একটা মূর্তির মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুচেতার শেষ কথাগুলো তাঁর স্নায়ুর ভেতর জলদ বাজনার মতো ঝড় তুলে যাচ্ছিল যেন। অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছিল তাঁর চরিত্রের মজবুত ভিতের তলায় কোথায় যেন চিড় ধরতে শুরু করেছে।

সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পর পরমা তার সেই খাতাটায় কিছু লিখে সুশোভনকে দেখিয়েছিল। লেখাটা ছিল এইরকম, 'ইন্টারভ্যালে সুচেতা পান কিনতে বাইরের লাউঞ্জে গিয়েছিল। তুমি সিগারেট খেতে

তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলে। তুজনে গোপন পরামর্শ করে কি এটা করেছিলে?'

সুশোভন চমকে উঠেছিলেন। তবে কি পরমার অসুস্থ রুগ্ন স্নায়ুতে কিছু ধরা পড়েছে? সুশোভন কাতর গলায় বলেছিলেন, 'না না, বিশ্বাস কর।'

পরমা তার জ্যোতিহীন ঘোলাটে চোখে শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করে সুশোভনের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর লিখেছিল, 'বাইরের লাউঞ্জে তোমার সঙ্গে সুচেতার দেখা হয় নি?'

সত্যি কথা বললে পরমার তুর্বল শরীরে এবং মনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। হয়ত এতে তার মৃত্যু লাফ দিয়ে কয়েক মাস ডিঙিয়ে অনেক কাছে এসে পড়বে; তার আয়ু আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সুশোভন অবরুদ্ধ গলায় পশুর মতো চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'না না, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।' জীবনে পরমার কাছে তাঁর সেই প্রথম মিথ্যে বলা।

পরমা ঠিক আগের মতোই আরেক বার সুশোভনের দিকে তাকিয়ে লিখেছিল, 'আমাকে ছুঁয়ে বল—'

বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর কথা বিশ্বাস করে নি পরমা। সুশোভন অন্ধের মতো শ্বাসরুদ্ধের মতো হাত বাড়িয়ে পরমার একটা হাত ছুঁয়েছিলেন।

মনে পড়ে, বায়োপ্সি রিপোর্টের পর দেখতে দেখতে মাস চারেক কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে অসুস্থতা বেড়েই যাচ্ছিল পরমার, বেড়েই যাচ্ছিল। ওষুধ খেয়ে বা 'রে' নিয়ে কিছুই হচ্ছিল না, বরং যন্ত্রণাটা আরো বাড়ছিল। শরীর দ্রুত ভেঙে গিয়েছিল তার; চামড়ার রং এবং মসৃণতা জ্বলে গিয়ে কুঁচকে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো দেখাত। চোখ তুটো দেড় ইঞ্চির মতো গর্তে ঢুকে গিয়েছিল।

বায়োপ্সি রিপোর্টের পর কিছুদিন তবু কনফারেন্সে গেলে একটু-আধটু ভালো লাগত; অন্তত ঘণ্টা তিন চারেক অন্যমনস্ক থাকা যেত।

পরে তা-ও আর ভালো লাগছিল না পরমার। চারদিকের পরিবেশ, লোকজন—সব যেন অসহ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। আসলে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে পরমা এইসময় একদিন লিখে জানিয়েছিল, 'আমাকে কলকাতার বাইরে কোথাও একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যেতে পার ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'তোমার শরীর খারাপ ; এই অবস্থায় বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে ?'

পরমা অস্থির হয়ে উঠেছিল। এবার সে লিখেছিল, 'আমি যাবই, আমি যাবই।'

'ঠিক আছে, ডাক্তারদের একটু জিজ্ঞেস করে নিই।'

বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্পেশালিস্টদের মতামত জানতে চাইলে তাঁরা বলেছিলেন, 'যেখানে পেশেন্টের ইচ্ছে নিয়ে যান। হার এণ্ড ইজ নীয়ারিং ভেরি ফাস্ট। এখন উনি যা খেতে চান খেতে দেবেন, যেখানে বেড়াতে চান নিয়ে যাবেন। নো রেসট্রিকসান।'

স্পেশালিস্টরা জানিয়ে দেবার পরও কলকাতার বাইরে কোথায় পরমাকে নিয়ে যাবেন, পুরী দার্জিলিং না শিলং, প্রথমটা ঠিক করতে পারছিলেন না সুশোভন। তাঁর মনে পড়েছিল ছোটনাগপুরে মধুপুরের কাছাকাছি ছোট্ট একটা শহর শেরমুণ্ডাতে তাঁদের একটা বিরাট কম্পাউণ্ডওলা বাংলো রয়েছে। ঠাকুরদার আমলে যখন তাঁদের সংসারে জলস্রোতের মতো হুড় হুড় করে পয়সা ঢুকছে সেই সময় বাংলোটা কেনা হয়েছিল। বাড়িটা দেখাশোনার জন্য একটা মালী ছিল। একধারে ঘর তুলে স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সে সেখানে থাকত। লোকটা দারুণ বিশ্বাসী এবং সৎ। ঠাকুরদা ব্যাঙ্কে কী ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, তার ফলে নিয়মিত সে সেখান থেকেই মাইনে পেয়ে যেত।

অমরেশ সমরেশদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুশোভন শেরমুণ্ডাতেই পরমাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তুজনেই গিয়েছিলেন। বুবুন তার কাকা-কাকীমাদের কাছে থেকে গিয়েছিল।

মনে পড়ে, তুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি একটা সময় তাঁরা

শেরমুণ্ডায় পৌঁছেছিলেন। ছেলেবেলায় এবং বড় হয়েও অনেক বার সেখানে গেছেন সুশোভন। তবে চাকরিতে ঢোকার পর খুব একটা যাওয়া-টাওয়া হত না।

মালীকে আগেই খবর দেওয়া ছিল। একটা টাঙ্গা ঠিক করে সে স্টেশনের গায়েই অপেক্ষা করছিল। সুশোভনরা কুলীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে বাইরে আসতেই দৌড়ে এসেছে সে। প্রায় সাত আট বছর বাদে দেখা। অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছিল মালীটা, পিঠ বেঁকে ধনুক, মাথার একটা চুলও আর কাঁচা ছিল না।

এতদিন বাদে সুশোভনকে দেখে তার চোখ খুশিতে চকচকিয়ে উঠেছিল। আনন্দে কী যে করবে মালীটা, ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কুলীদের মাথা থেকে মালপত্তর প্রায় কেড়ে নিয়েই টাঙ্গায় রেখেছিল সে ; তারপর তাড়া দিয়ে সুশোভনদের গাড়িতে তুলে টাঙ্গাওলাকে বলেছিল, 'চালাও তুরন্ত—'

স্টেশন থেকে সুশোভনদের বাংলো বাড়িটা মাইলখানেক দূরে ; শেরমুণ্ডা শহরের একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে। সবাই উঠবার পর টাঙ্গা ছুটতে শুরু করেছিল।

স্টেশনের কাছাকাছি ছোটখাটো বাজার। বাজার আর কি ; ছোট বড় পাঁচ সাতটা দোকান গা জড়াজড়ি করে রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ভোজপুরী হালুইকর দেওকীনন্দনের মিঠাইর দোকান, মিত্র ব্রাদার্সের মনোহারি দোকান, রাজপুত রাখো সিং-এর কাপড়ের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবাই চেনা মানুষ ; আট দশ বছরে তাদের চেহারায় আরেকটু বয়সের ছাপ পড়েছে। টাঙ্গাটা যখন দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল দোকানদারেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'নমস্কার সুশোভনবাবু।' কিংবা 'নমস্তে ব্যানার্জিসাব।'

সুশোভনও প্রতি-নমস্কার জানিয়েছিলেন।

দোকানদারেরা বলেছিল, 'অনেকদিন পর এলেন ; এবার কিছু-দিন থাকছেন তো ?'

'সেই রকমই ইচ্ছে।'

চোখের পলকে বাজার পেরিয়ে টাঙ্গাটা বাইরের রাস্তায় চলে এসেছিল। এই ছোট্ট শেরমুণ্ডা শহরটার মেজাজ পাহাড়ী। বাজারের পর থেকেই চড়াই-উতরাই শুরু হয়েছে। দু'ধারে কোথাও খাদ, কোথাও জ্যামিতিক নানা নকশার মতো মকাই কিংবা জনারের টুকরো টুকরো খেত। আর আছে নানা ধরনের গাছ আর ঝোপঝাড়। সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বিরাট বিরাট কম্পাউণ্ডওলা একেকটা বাংলো। পুরনো বাড়ি ছাড়াও নতুন নতুন আরো অনেক বাড়ি চোখে পড়ছিল। আগে ছোটনাগপুরের এই ছোট্ট শহরটা পৃথিবীর সব শান্তি আর নির্জনতা সারা গায়ে লাবণ্যের মতো মেখে চুপচাপ পড়ে থাকত। কিন্তু আট ন' বছর বাদে টাঙ্গায় করে এ শহরের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে সুশোভনের মনে হয়েছিল আগের সেই নির্জনতা আর নেই; শেরমুণ্ডাতে লোকজন বেশ বেড়ে গেছে। এখান থেকে অনেক দূরে ধোঁয়ার দৈত্যের মতো ছোটনাগপুরের রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছিল।

এ শহরের সব পুরনো মানুষকেই চেনেন সুশোভন। যেতে যেতে তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যাচ্ছিল। যেমন ঠিকাদার বরদা ঘোষাল এবং তার দুই ছেলে নরেশ আর হরেন, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার গজানন বটব্যাল, উকিল বজরঙ্গীপ্রসাদ, শেরমুণ্ডা হাই স্কুলের অ্যাসিস্টান্ট হেড মাস্টার নওলকিশোর ঝা ইত্যাদি ইত্যাদি। সুশোভনকে এতদিন পর দেখে তারাও খুব খুশী। সবাই বলছিল এত দিন পর তিনি যখন এসেছেন তখন আর চট করে পালিয়ে যেতে দেওয়া হবে না; বেশ কিছুদিন সুশোভনকে এখানে থাকতে হবে।

যেতে যেতে মৈথিলি মেশানো দেহাতী হিন্দীতে বুড়ো মালীটা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল, 'তুমলোগ মেরাকো ভোলি গয়েল; বিলকুল ভোলি গয়েল—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'না না ভুলব কেন? ঠিক মনে আছে তোমাকে।'

'ভোলি নেহি গয়েল তো শেরমুণ্ডিমে আট দশ সাল নেহি আওল কাঁহে ?'

'এই নানা রকম কাজ; তাই আসতে পারি নি। তুমি কেমন আছো ?'

'বুড্ঢা আদমি য্যায়সা রহনে সাকে অয়সা—' কথা বলতে বলতে পরমাকে অনবরত লক্ষ্য করে যাচ্ছিল মালীটা। একসময় সে বলেই ফেলেছিল, 'ইয়ে জরুর বহুজী হোয়েগী !'

সুশোভন মাথা নেড়েছিলেন, 'হ্যাঁ।'

হাতজোড় করে বাঁকানো পিঠটা আরেকটু ধনুক বানিয়ে মালী বলেছিল, 'নমস্তে বহুজী—' বলেই সুশোভনের দিকে ফিরেছিল, 'বহুজী বহোত দুবলা পাতলা, কুছ বিমারী হ্যায় ?'

'ওর শরীর ভালো না।'

কথায় কথায় কত দূর চলে এসেছিলেন, সুশোভনের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিল, 'কে যায়, সুশোভন না ?'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই সুশোভন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের টাঙ্গাটা শহরের মাঝ-মধ্যিখানে শেরমুণ্ডা মিশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে আর মিশন-গেটের কাছে ফাদার টারমোর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছন দিকে তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা বিরাট কম্পাউণ্ডের ভেতর পুরনো আমলের ছোট চার্চ, চার্চের মাথায় কাঠের ক্রশ, সামনে পাথরের তৈরি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি এবং চারধারে অরফ্যানেজের ছোট বড় অনেকগুলো টিনের বাড়ি চোখে পড়েছিল। সুশোভন ব্যস্তভাবে টাঙ্গাওলাটাকে বলেছিলেন, 'এই রুখো, রুখো—'

তক্ষুনি টাঙ্গা থেমে গিয়েছিল। এদিকে বড় বড় পা ফেলে ফাদার টারমোর ততক্ষণে কাছে চলে এসেছিলেন।

ফাদারের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু অত বয়সেও তাঁর চেহারা ছিল আশ্চর্য টান টান। প্রায় সাত ফুটের মতো হাইট। গায়ের চামড়া খানিকটা কুঁচকে দেওয়া আর মাথার চুলগুলোকে লালচে

শিমুল তুলো বানানো ছাড়া সময় তাঁর গায়ে তেমন করে আঁচড় কাটতে পারে নি।

সুশোভন জানতেন ফাদার টারমোর জাতে আইরিশ। আয়ারল্যাণ্ডের মেথডিস্ট চার্চ থেকে প্রীচিং-এর জন্য তিনি সুদূর ভারতবর্ষের এই নগণ্য শহরে ছুটে এসেছিলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন চারপাশের ওঁরাও আর তুরীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি খ্রীস্টমাহাত্ম্য প্রচার করতেন ; আদিবাসী এবং গ্রামের গরিব কৃষাণ-টৃষাণদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন। পরে এসব আর তাঁর ভালো লাগত না। ধর্মপ্রচার ছেড়ে দিয়ে ফাদার টারমোর চারদিকের গরীব দুঃখী এবং অনাথ শিশুদের যোগাড় করে চার্চের ভেতরেই একটা অরফ্যানেজ খুলেছিলেন। এ দেশের তো বটেই, পৃথিবীরও নানা দেশ আর নানা বেনেভোলেণ্ট ফাণ্ড থেকে সাহায্য নিয়ে এই অনাথ আশ্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সারা জীবন এই নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন ফাদার টারমোর। ওঁরাও এবং তুরীদের ভাষা ছাড়াও বাংলা আর হিন্দী তিনি জলের মতো বলতে পারতেন। আশেপাশের পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে যত গ্রাম-ট্রাম আছে সেখানকার সব মানুষ তাঁকে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করত।

মনেপ্রাণে ফাদার টারমোর এ দেশেরই মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন ; নিজেকে পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান বলেই পরিচয় দিতেন। মিশনারীদের সারপ্লিস ক্বচিৎ কখনো পরতেন ; তাঁর পোশাক বলতে ছিল পাজামা আর হাফ-হাতা লম্বা-ঝুল ফতুয়া। মুখে থাকত পৃথিবীর সব চাইতে নিষ্পাপ আর পবিত্র হাসিটি। চারপাশের লোকজন অশিক্ষিত আড়ষ্ট জিভে তাঁর নামটা শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারত না। তারা বলত 'টালমন সাহাব' কিংবা 'টালমন বাবা'।

ফাদার টারমোর সুশোভনকে দেখে আর সবার মতোই খুশী হয়েছিলেন, 'কেমন আছ মাই চাইল্ড?'

'ভালো আছি।'

সুশোভন টাঙ্গা থেকে নেমে ফাদারকে প্রণাম করতেই তিনি

তাঁকে তুলে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরেছিলেন। এই জড়ানোর মধ্যে ফাদারের হৃদয়ের উষ্ণতা আর স্নেহ যেন মাখানো ছিল।

মনে আছে এর পর এলোমেলো দু-চারটে কথা হয়েছিল। এত দিন কেন সুশোভন শেরমুণ্ডাতে আসেন নি, চাকরিবাকরি কী করছেন, এতকাল বাদে যখন এসেছেন তখন তাঁকে সহজে ছাড়া হবে না ইত্যাদি ইত্যাদির ফাঁকে হঠাৎ ফাদারের চোখ গিয়ে পড়েছিল পরমার ওপর। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'উনি নিশ্চয়ই আমাদের বৌমা—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ—'

'দুষ্টু ছেলে, বৌমা সঙ্গে রয়েছেন অথচ আলাপ করিয়ে দাও নি! ঠিক আছে, আলাপ করাতে হবে না। আমিই ওটা করে নিচ্ছি।' বলে সোজা টাঙ্গার কাছে চলে গিয়েছিলেন ফাদার টারমোর। পরমাকে নিজের নাম জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে তুমি কাকাবাবু বলে ডাকবে।'

আস্তে মাথা নেড়েছিল পরমা। তারপর প্রণাম করবার জন্য টাঙ্গা থেকে নামতে যাবে, ফাদার তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, 'না না, প্রণাম করতে হবে না। তুমি ওখানেই বোসো—' বলতে বলতেই তাঁর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, 'এ কি মা, তুমি এত রোগা কেন? কী হয়েছে তোমার?'

পরমা চুপ করে বিষণ্ন করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল।

ফাদার টারমোর বলেছিলেন, 'কী হল, চুপ করে রইলে কেন? বল—'

সুশোভন কাছে এগিয়ে এসে ফাদারের কানে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, 'ও কথা বলতে পারে না; ভীষণ অসুস্থ—'

ফাদার টারমোর চমকে উঠেছিলেন, তারপর ভালো করে পরমাকে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অসুখটা কী?'

আগের মতোই ফিসফিসিয়ে সুশোভন বলেছিলেন 'আপনাকে পরে বলব।'

'ঠিক আছে; তোমাদের আর আটকে রাখব না। লম্বা ট্রেন জার্নি

করে টায়ার্ড হয়ে পড়েছ। আমি সন্ধ্যের সময় যাব'খন। বৌমাকে দেখে-যদি ওষুধ-টোষুধ দিতে হয় দিয়ে আসব।'

সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল ফাদার টারমোর একজন বিরাট ডাক্তার। অরফ্যানেজ চালানো ছাড়াও চারপাশের গরীব-দুঃখীদের তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসাও করে থাকেন। প্রীচিং-এর কাজে আসার আগে তিনি এম· আর. সি· পি· হয়েছিলেন।

সুশোভন অনেকখানি ভরসা পেয়ে গিয়েছিলেন যেন। যদিও পরমার বাঁচার কোন আশা নেই এবং কলকাতা থেকে প্রচুর ওষুধ-পত্তরও নিয়ে এসেছেন তবু হঠাৎ যদি পরমার অসুখটা খারাপ দিকে বাঁক নেয় কিংবা যন্ত্রণাটা আরো বাড়ে ফাদারকে খবর দেওয়া যাবে। হাতের কাছে একজন ডাক্তার থাকলে, বিশেষ করে ফাদার টারমোরের মতো ডাক্তার এবং স্নেহময় মানুষ, অনেকখানি সাহস পাওয়া যায়। সুশোভন তাঁর হাত দুটো ধরে ব্যগ্রভাবে বলেছিলেন, 'আসবেন কিন্তু ফাদার, নিশ্চয়ই আসবেন।' বলে টাঙ্গায় উঠেছিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের বাংলোয় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

সুশোভনের বাংলোটা উঁচু টিলার মাথায়। তার তলায় খাদ, খাদের পর শাল আর মহুয়ার বন। দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে পেনসিলের আবছা আঁচড়ের মতো ছোটনাগপুরের তরঙ্গিত পাহাড়মালা। বাংলোর লাউঞ্জে বসলে এই সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে।

জায়গাটা খুবই ভালো লেগে গিয়েছিল পরমার। তা ছাড়া বুড়ো মালী, তার বউ এবং তাদের একমাত্র জোয়ান ছেলে ছনিয়া, ছনিয়ার বউ লচ্ছু—সবাই সুশোভনরা, বিশেষ করে পরমা কিসে একটু আনন্দ পাবে, কিসে তার মুখে একটু হাসি ফুটবে সে জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। সব সময় তারা কেউ না কেউ পরমাকে ঘিরে থাকত। ছনিয়ার বউ লচ্ছুটা ছিল একেবারে ছেলেমানুষ; মোটে বারো বছর বয়স। প্রথম প্রথম নাকের ডগা পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে দূরে দূরে থাকত। তারপর পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা পেরুতে না পেরুতেই কোথায় গেল তার ঘোমটা আর কোথায় গেল লজ্জা। ডোরাকাটা আটহাতী রঙীন শাড়িটা

কিছুতেই সামলাতে পারত না লচ্ছু। কোমরের কাছে পুঁটলির মতো সেটা গুটিয়ে পরমার পায়ের সামনে বসে মৈথিলী মেশানো হিন্দীতে অনবরত কথা বলে যেত আর সমানে হাত-পা-মাথা নাড়ত। শুধু কথাই বলত না, সেটা আবার অঙ্গভঙ্গি করে দেখানোও চাই। তার যা অভিনয়ের ক্ষমতা তাতে কলকাতার অনেক নামকরা অভিনেত্রীর নাক কেটে দিতে পারত। যাই হোক লচ্ছু ছিল কথা বলার জ্যান্ত একটা মেসিন। কতরকমের গল্প যে করত লচ্ছু! তার বাপের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে সেই পূর্ণিয়া জেলায়। সেখানে ট্যারাবাঁকা বেঁটে সীসম গাছগুলো কি-রকম দাঁড়িয়ে থাকে, কাদাখোঁচা পাখিরা কেমন করে ডিঙি মেরে মেরে হাঁটে, তা থেকে শুরু করে ছট পরবের সময় মেলায় গিয়ে সে যে জাদুকরের খেলা আর সিনেমা দেখেছিল, সে সব কথা বলে যেত লচ্ছু। সব চাইতে সে বেশী করে বলত তার স্বামী ছনিয়ার কথা। ছনিয়াটা নাকি কাছাকাছি অন্য কেউ না থাকলেই তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়; রাত্তিরে পাশাপাশি শুয়ে বদমাইশি করতে চায়। আর এসব করতে গেলেই নাকি আঁচড়ে কামড়ে একশা করে দেয় লচ্ছু। সরল নিষ্পাপ মুখে দুলে দুলে ছনিয়ার একেকটা কাণ্ড-কারখানার কথা শেষ করে সে বলত, 'বহোত বেসরম, নেহি বহুজী—'

ওর কথা শুনতে শুনতে পরমার মুখে ক্ষীণ রেখায় একটু হাসি ফুটে উঠত। শরীরের কষ্টটা মুহূর্তের জন্য হলেও সে ভুলে যেত।

মনে পড়ে, বাংলো ছেড়ে বাইরে যেতে চাইত না পরমা। শেড দেওয়া ঢালা লাউঞ্জে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে প্রায় সারাদিন ধু-ধু ছোট-নাগপুর রেঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকত। পায়ের কাছে বসে লচ্ছু মৌমাছির মতো একটানা গুনগুনিয়ে যেত। পরমা বেরুত না বলে সুশোভনেরও বেরুনো হত না। তিনিও সারাদিন পরমার পাশে বসে থাকতেন। তাঁর মনে হত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন দ্বীপে যেন নির্বাসিত হয়ে আছেন।

পরমার হাতের কাছে একটা খাতা আর পেন থাকত। লচ্ছুর বকবকানি শুনতে শুনতে সে অন্যমনস্কর মতো কখনও লিখত, 'জায়গাটা

সুন্দর। খুব ভালো লাগছে।' কখনও লিখত, 'বেশিদিন তো বাঁচব না, মরার আগের দিন ক'টা এখানেই থাকব।' লিখে খাতাটা সুশোভনের দিকে এগিয়ে দিত।

বেরুনো না হলেও ফাদার টারমোর রোজ সন্ধ্যেবেলায় একবার করে আসতেন। পরমার অসুখটা কী, তিনি জেনে গিয়েছিলেন। মৃত্যু যেখানে অনিবার্য সেখানে কিছু করবার থাকে না। তবে মৃত্যুর কষ্টটাকে খানিকটা সহনীয় করা যেতে পারে; সেই জন্যই তিনি খানিকক্ষণ সঙ্গ দিয়ে যেতেন।

মনে পড়ে, এভাবে তিন চার দিন কাটবার পর পরমা তার খাতায় লিখেছিল, 'এভাবে সারাদিন রুগীর কাছে বসে থেকে তুমিও রুগী হয়ে যাবে। যাও, একটু ঘুরে-টুরে এসো—'

সুশোভন বলেছিলেন, 'তুমি একা একা বসে থাকবে—'

পরমা লিখেছিল, 'একা কোথায়? লচ্ছু আছে, ছনিয়া আছে, মালী আর মালীর বউ আছে। তুমি যাও—' একরকম জোর করেই সুশোভনকে একদিন বিকেলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে।

শেরমুণ্ডা শহর আর কতটুকু! যেদিকেই হাঁটা যাক, এক ঘণ্টার মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। নিজেদের বাংলো থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সুশোভন উত্তর দিকের শেষ মাথায় চলে এসেছেন খেয়াল ছিল না। এই জায়গাটার নাম নর্থ পয়েন্ট। হঠাৎ একটা দৃশ্য চোখে পড়তে তাঁর চমক লেগে গিয়েছিল।

নর্থ পয়েন্ট যে টিলাটায় শেষ, তার তলায় উতরাই ক্রমশ ঢালু হয়ে দূরের ঘাসে-ভরা সবুজ উপত্যকায় নেমে গেছে।

সুশোভন দেখতে পেয়েছিলেন উতরাই বেয়ে একটা ধবধবে সাদা রঙের ঘোড়া উঠে আসছে, তার পিঠে যে সওয়ার রয়েছে সে পুরুষ না; একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবতী।

শেরমুণ্ডাতে রাজপুত লছমীনারায়ণ সিং-এর কাছে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যেত। টুরিস্ট মরসুমে যে-সব লোকজন আসত তাদের অনেকেই হর্স-রাইডের জন্য ঘোড়া ভাড়া নিয়ে চারধারে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু

কোন মেয়েকে আগে আর কখনও শেরমুণ্ডায় ঘোড়া চড়তে দেখেন নি সুশোভন।

উতরাই পেরিয়ে ঘোড়াটা যখন কাছে চলে এসেছিল তখন বিস্ময়টা কয়েক হাজার গুণ যেন বেড়ে গিয়েছিল সুশোভনের। তার সওয়ার আর কেউ না—সুচেতা।

সেটা ছিল গরম কাল ; সময়টা এপ্রিলের শেষাশেষি। সুচেতার পরনে সেই মুহূর্তে ছিল হট প্যান্ট আর স্পোর্টস শার্ট। সোনার স্তূপের মতো তার উরু, পাহাড়চূড়ার মতো বুক, মেদহীন কোমর এবং সুগভীর নাভির কাছাকাছি স্বর্ণাভ উপত্যকা—মোট কথা তার দারুণ আকর্ষণীয় শরীরটা হট প্যান্ট আর শার্ট চৌচির করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

সুচেতাকে শেরমুণ্ডা শহরে এই পোশাকে ঘোড়ার পিঠে দেখবেন, সুশোভন ভাবতে পারেন নি। মিউজিক কনফারেন্সে যে মার্জিত অভিজাত ভদ্র স্নিগ্ধ মেয়েটিকে অনেক বার দেখেছেন, যার পোশাক এবং অলঙ্কারে থাকত সুরুচির ছাপ তাকে যেন চেনা যাচ্ছিল না। সুশোভন বলেছিলেন, 'আপনি এখানে!'

অনেকটা ঘোড়া ছোটানোর জন্যই হয়তো কপালে আর ঘাড়ে পোকরাজের দানার মতো কণা কণা ঘাম জমেছিল সুচেতার। জামা-টামা ঘামে ভিজে গিয়েছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে সে-ও অবাক হয়ে বলেছে, 'আমারও তো একই প্রশ্ন, আপনি এখানে কী করে?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'আমাদের এ শহরে একটা বাড়ি আছে। পরমাব কলকাতায় ভালো লাগছিল না ; তাই নিয়ে এলাম।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সুচেতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কবে এসেছেন?'

'তিন চারদিন আগে।'

'শেরমুণ্ডায় আসবেন, আমাকে বলেন নি তো!'

মনে আছে শেষদিকে সুচেতা সম্পর্কে অদ্ভুত একটা কমপ্লেক্স ঢুকে

গিয়েছিল পরমার মাথায়। সুশোভনকে তার সঙ্গে জড়িয়ে অনেক কিছু ভাবত সে এবং সন্দেহও করত। পরমা কষ্ট পায়, সেজন্য মিউজিক কনফারেন্সে দেখা হলে সুশোভন সুচেতার সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলতেন না ; ভদ্রভাবে এড়িয়েই চলতেন। তিনি বলেছিলেন, 'হঠাৎই আসা হয়ে গেল ; তাই আপনাকে জানাতে পারি নি।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'আপনি কবে এসেছেন ?'

'কাল।'

'কোথায় উঠেছেন ?'

'এই নর্থ পয়েন্টেই। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে ; সেখানেই উঠেছি। চলুন না, বাড়িটা দেখে যাবেন। একসঙ্গে একটু কফিও খাওয়া যাবে।'

সুচেতা দুরন্ত আকর্ষণে যেন টানছিল। তবু একটু আপত্তি করেছিলেন সুশোভন, 'আজ থাক না, আরেক দিন যাব—'

আদুরে গলায় সুচেতা বলেছিল, 'প্লীজ চলুন—'বলে চোখের কোণে এবং ঠোঁটে জাদুকরীর মতো হেসেছিল। তারপর ঘোড়াটার লাগাম ধরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলতে শুরু করেছিল।

সুশোভন আর কিছু বলেননি। অদ্ভুত এক নেশার ঘোরেই যেন সুচেতার পাশাপাশি হেঁটে গিয়েছিলেন। যেতে যেতে বলেছিলেন, 'আপনি কি একাই, না আর কেউ সঙ্গে এসেছে ?'

সুন্দর সুগোল ঘাড়টা বাঁকিয়ে সুচেতা বলেছিল, 'আমি কি এতই অবলা যে একা আসতে পারি না ?' একটু চুপ করে থেকে চোখ ধীরে ধীরে কুঁচকে ফিসফিসিয়ে আবার বলেছিল, 'একাই এসেছি।'

মনে পড়ে নর্থ পয়েন্টের একধারে সুন্দর একটা বাংলো-বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সুচেতা। সেই হট প্যান্ট-ট্যান্ট পরেই মুখোমুখি বসে কফি খেতে খেতে কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করেছিল সুচেতা। অন্যমনস্কর মতো কিংবা বলা যায় আচ্ছন্নের মতো, মাঝে মাঝেই তার শরীরের দিকে তাকাচ্ছিলেন সুশোভন ; পরক্ষণেই অবশ্য চোখ ফিরিয়ে

নিচ্ছিলেন। সুচেতার দেহে মাতিয়ে দেবার মতো এমন কিছু ছিল যাতে সেদিকে না তাকিয়ে পারা যায় নি।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক সময় সুশোভন বলেছিলেন, 'আপনি যে ঘোড়ায় চড়তে পারেন, আমি জানতাম না।'

'আপনি আমার কতটুকু জানেন!' বলেই সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে গলাটা ঝপ করে নামিয়ে দিয়ে সুচেতা বলেছিল, 'আমি বাঘের পিঠেও চড়তে পারি।'

সুশোভন কী বলবেন, ভেবে পান নি।

সুচেতা এবার বলেছিল, 'আচ্ছা এই হট প্যাণ্টে আমাকে কিরকম দেখাচ্ছে? অ্যাট্রাকটিভ?'

সুশোভন চমকে উঠেছিলেন। তবে কি তিনি বার বার সুচেতার দিকে যে আচ্ছন্নের মতো তাকিয়েছেন, সেটা সে লক্ষ্য করেছে? গল গল করে ঘামতে শুরু করেছিলেন সুশোভন; এবারও কোন উত্তর দিতে পারেন নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আজ যাই—'

'এখনই যাবেন?'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যে হয়ে এল। পরমা একা বাড়িতে রয়েছে—' বলতে বলতে বাংলোর বাইরে চলে এসেছিলেন সুশোভন।

সুচেতাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। বলেছিল, 'কই আমাকে আপনাদের বাড়ি যেতে বললেন না তো?'

সুশোভন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, এই মানে—'

তাঁর চোখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চাপা গলায় সুচেতা বলেছিল, 'আমি গেলে পরমাদি বোধহয় খুশী হবে না?'

মেয়েটা কি অন্তর্যামী? রুদ্ধশ্বাসে সুশোভন বলেছিলেন, 'না না, তা কেন?'

'আপনাকে এমব্যারাসিং অবস্থায় ফেলতে চাই না। ভয় নেই, আমি যাব না। কিন্তু—'

'কিন্তু কী ?'

সুচেতা বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ?'

সুশোভন কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুচেতা আবার বলে উঠেছিল, 'কাল এই নর্থ পয়েন্টে আসুন না—'

বুকের ভেতর শ্বাস যেন আটকে গিয়েছিল সুশোভনের, 'আসতে পারব কিনা ঠিক বলতে পারছি না—'

সেদিন বাংলোয় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে নেমে গিয়েছিল। পরমা সামনের সেই ঢালা বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ছোটনাগপুর রেঞ্জের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাদার টারমোর তার পাশে বসে গল্প করে যাচ্ছিলেন।

ফাদার চলে যাবার পর সুশোভন একবার ভেবেছিলেন সুচেতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা বলবেন। কিন্তু তাতে হয়ত জটিলতাই বাড়বে ; শেষ পর্যন্ত তাই আর বলেন নি।

মনে আছে পরের দিনও খাতায় লিখে তাঁকে বেড়াতে যেতে বলেছিল পরমা। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন সুচেতা তাঁকে চুম্বকের মতো টানছিল। বাংলো থেকে বেরিয়ে নিজের অজান্তে সুশোভন কখন যে নর্থ পয়েন্টে চলে এসেছিলেন, খেয়াল ছিল না।

তখন বিকেল হয়ে গেছে। সূর্যটা আকাশের তেলতেলে গড়ানে পাড় বেয়ে ছোটনাগপুর রেঞ্জের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দূর থেকেই দেখা গিয়েছিল নর্থ পয়েন্টের টিলার মাথায় সুচেতা দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বেলার রক্তাভ আলোয় তাকে কোন অলৌকিক হল্কার মতো মনে হয়েছিল। অন্ধ লোভী পতঙ্গের মতো সুশোভন সেদিকে ছুটে গিয়েছিলেন।

কাছে আসতেই সুচেতা হেসেছিল, 'এলেন তা হলে—'

সুচেতার পরনে সেদিন ছিল প্যারালাল আর চক্কর বক্কর ছাপ-মারা জামা, পায়ে আট ইঞ্চি হিলের জুতো। সুশোভন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

সুচেতা বলেছিল, 'আমি জানতাম আপনি আসবেন—'

'জানতেন ?'

'নিশ্চয়ই। আমি যখন ডেকেছি তখন আপনার সাধ্য কি না এসে পারেন। চলুন ওধারের ভ্যালিতে বেড়িয়ে আসি।'

সুচেতার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার ক্ষেপিয়ে-দেওয়া আশ্চর্য শরীরের দিকে যতবার নজর চলে যাচ্ছিল ততবারই পরমাব কথা ভাবতে চেষ্টা করছিলেন সুশোভন। পরমার দেহে কিছুই নেই, চুল উঠে গেছে, বুক সমতল, চোখ দেড় ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো। তিনি তখন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, আবার ঈশ্বরকে অবিশ্বাসও করতেন না। তবু মনে মনে প্রার্থনার মতো করে বলেছিলেন, 'হা ঈশ্বর, আমি যে পরমাকে ভালবাসি।' কিন্তু পরমুহূর্তেই সুচেতার আশ্চর্য শরীর তাঁর সমস্ত ভাবনাকে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাচ্ছিল যেন।

উপত্যকার শালবনে যেতে যেতে সুচেতা বলেছিল, 'পরমাদি এখন কেমন আছে ?'

সুশোভন জোরে শ্বাস টেনে বলেছিলেন, 'কলকাতায় যেমন দেখেছিলেন তার চাইতে আরো খারাপ।'

একটু চুপ করে থেকে সুচেতা বলেছিল, 'আই ফীল ফর ইউ—' এই কথাটা আরও একবার বলেছিল সে।

সুশোভন উত্তর দেয় নি।

সুচেতা আবার বলেছিল, 'আমি যে এখানে এসেছি, পরমাদিকে জানিয়েছেন ?'

সুশোভন চমকে উঠেছিলেন, 'না, মানে—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছেন ?'

'এমনি। আমার মনে হয়েছিল, আপনি বলবেন না। আমার ধারণাটা দেখা যাচ্ছে কারেক্ট।'

এর পর থেকে নিশির ডাকের মতো কোন অলৌকিক ঘোরের মধ্যে রোজ বিকেলে নর্থ পয়েন্টে চলে আসতেন সুশোভন। টিলার মাথায় কোন অপার্থিব কুহকিনীর মতো দাঁড়িয়ে থাকত সুচেতা। কোন দিন সে তাঁকে নিয়ে চলে যেত দূরের উপত্যকায়, কিংবা দেবদারু বনে।

কোন দিন লছমীনারায়ণ সিং-এর কাছ থেকে ঘোড়া ভাড়া করে চলে যেত বহুদূরে ছোটনাগপুর রেঞ্জের দিকে।

সপ্তাহদুয়েক কেটে যাবার পর একদিন বিকেলে নর্থ পয়েন্টের টিলার মাথায় এসে সুচেতাকে দেখতে পান নি সুশোভন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তার খোঁজে সেই সুন্দর বাংলোটায় চলে গিয়েছিলেন। বাইরে থেকে কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। না ঝি, না চাকর, না মালী—কাছাকাছি কেউ ছিল না। তখন তিনি ডেকেছিলেন, 'সুচেতা দেবী—'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে সুচেতার গলা ভেসে এসেছিল, 'আসুন—'

বাংলোয় ঢুকে প্রথমে ড্রইং রুমের কাছে আসতেই সুচেতার গলা আবার শোনা গিয়েছিল, 'ড্রইং রুমে না ঢুকে আপনি সোজা চলে আসুন।'

'আপনি কোথায় ?'

'আমি যেরকম বলছি সেরকম আসুন, তা হলেই দেখতে পাবেন।'

ড্রইং রুম বাঁয়ে ফেলে সামনের প্যাসেজ ধরে খানিকটা এগুতেই অদৃশ্য থেকে সুচেতা আবার বলেছিল, 'টার্ন রাইট, দেন লেফ্ট, দেন রাইট—'

জুতোর শব্দ শুনেই হয়ত সুচেতা তাঁর গতিবিধি বুঝতে পারছিল। লেফ্ট আর রাইট করতে করতে শেষ পর্যন্ত সুশোভন একটা বড় ঘরের সামনে আসতেই সুচেতা আবার বলেছিল, 'ওয়েলকাম টু দিস রুম—'

ঘরটার সব জানলা বন্ধ; দরজায় একটা দামী মোটা পর্দা ঝুলছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সুশোভন বলেছিলেন, 'আসব ?'

'আসতেই তো বললাম। মোস্ট ওয়েলকাম—'

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। ঘরে স্নিগ্ধ নীলাভ আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় চোখে পড়েছিল এক ধারে একটা খাটের ওপর সুচেতা বসে আছে। আদিম মানবীর মতো তার শরীর সম্পূর্ণ নগ্ন।

সুচেতা গাঢ় গভীর গলায় ডেকেছিল, 'এসো—' সুশোভনকে সেই তার প্রথম তুমি বলা।

সুন্দর নারীদেহ আগেও দেখেছেন সুশোভন। পরমার শরীরও একসময় চমৎকার ছিল। কালো টাকা ধরতে গিয়ে ঘূর্ণায়মান গোলাকার খাটের ওপর সেই মেয়েটির পাথরকাটা মূর্তির মতো অনাবৃত শরীরও দেখেছিলেন। কিন্তু সুচেতার মতো এমন আশ্চর্য নগ্ন দেহ আগে আর কখনও দেখেন নি।

সুশোভন কখনও মদ খান নি। কিন্তু পুরো এক বোতল 'র' হুইস্কি খাওয়ার মতো তাঁর মাথা অসহ্য টলছিল ; মনে হচ্ছিল চোখের তারাদুটো প্রচণ্ড রক্তচাপে ফেটে বেরিয়ে যাবে। নাকের ভেতর থেকে উত্তপ্ত লু-বাতাসের মতো নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছিল।

খসখসে জড়ানো গলায় সুচেতা আবার ডেকেছিল, 'কী হল, এসো—' তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত সেক্সি আর নেশা-মাখানো।

হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করেছিলেন সুশোভন। মুহূর্তে শরীরের সব শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়তে পড়তে অবরুদ্ধ গোঙানির মতো শব্দ করে তিনি বলেছিলেন, 'ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো—'

আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে কাছে দাঁড়িয়েছিল সুচেতা। দুহাতে সুশোভনকে তুলে ধরে বলেছিল, 'এসো—'

'না না।'

তীক্ষ্ণ চাপা ধিক্কারের গলায় সুচেতা এবার বলেছিল, 'ভীতু—কাপুরুষ!'

সুশোভন আর্তনাদের মতো বলে গিয়েছিলেন, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—'

আস্তে আস্তে কোন মায়াকাননের সোনালী সাপিনীর মতো দু-হাত দিয়ে সুশোভনের গলা জড়িয়ে তীব্র আবেগে দীর্ঘ একটা চুমু খেয়েছিল সুচেতা। তার মুখের ভেতর থেকে আগুনের হল্কা সুশোভনের মুখে, মুখ থেকে রক্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর সুশোভনকে ছেড়ে দিয়ে সুচেতা বলেছিল, 'আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম। পরমা বেশিদিন বাঁচবে না। মনে রেখো

আজ থেকে তোমার গোটা ভবিষ্যৎ আমার হাতে তুলে নিলাম।'

প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন ঘটে গিয়েছিল সুশোভনের মধ্যে। অন্ধের মতো, মূর্ছিতের মতো টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সারা জীবন তিনি সৎ থেকেছেন। তাঁর সামনে প্রলোভন বার বার হাজার রকমের মনোহারি প্রদর্শনী সাজিয়ে দিয়েছে। প্রবল পৌরুষে এতদিন সব লোভকে সুশোভন জয় করেছেন। কিন্তু তিনি মানুষ। রক্ত এবং মাংসে তৈরি এই শরীর এবং শরীরের ভেতর চরিত্রের যে ভিত এতকাল প্রাণপণে সেটা অটুট রেখেছেন। কিন্তু একটি মুহূর্তে তাঁর এতদিনের সততা, মনুষ্যত্ব, দৃঢ়তা সব কিছুর শিকড় উপড়ে গিয়েছিল যেন। নিজের অনিবার্য পতন অনুভব করতে করতে তিনি মনে মনে বলেছিলেন, 'হা ঈশ্বর, আমি একটা মানুষ—আমি একটা মানুষ।'

এর পর আরো তিন চারটে দিন কেটে গেছে। একটা জঘন্য ক্রীতদাসের মতো এর মধ্যে প্রতিটি দিন সুশোভন নর্থ পয়েন্টে সুচেতার কাছে গেছেন আর মনে মনে নিজের মৃত্যুকামনা করেছেন। তবু না গিয়ে পারেন নি।

মনে পড়ে একদিন সুচেতার কাছ থেকে ফেরার পর নিজেদের বাংলোয় ফিরে সুশোভন দেখেছিলেন পরমা স্থির একটা মূর্তির মতো বসে আছে। তাঁর মুখোমুখি বসে ছিলেন ফাদার টারমোর। তাঁর পায়ের কাছে লচ্ছু মৌমাছির মতো সমানে ভনভনিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সব কিছুই বোধহয় শুনছিল না পরমা। সুশোভনকে দেখেই পরমা খসখসিয়ে লিখেছিল, 'মেয়েটা কে?'

একটা তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা যেন সুশোভনের বুকের ভেতর আমূল বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তিনি বলেছিলেন, 'কার কথা বলছ?'

পরমা লিখেছিল, 'রোজ বিকেলে আমাকে লুকিয়ে যার কাছে অভিসারে যাও—'

'কে বলেছে এসব কথা?' সুশোভনের গলার স্বর ভেঙেচুরে গিয়েছিল যেন।

পরমা লিখেছিল, 'ছনিয়া বলেছে, মালী বলেছে, যে গয়লা দুধ দিয়ে যায় সে বলেছে। অস্বীকার করতে পারো ?'

সুশোভন পতনের শেষ মাথা থেকে বলেছিলেন, 'কাকে দেখতে ওরা কাকে দেখেছে !'

পরমা লিখেছিল, 'এতগুলো লোক ভুল দেখল। মেয়েটা কি সুচেতা ?'

সুশোভন মৃত্যুর মতো কিছু একটা অনুভব করতে করতে বলেছিলেন, 'সুচেতা এখানে কি করে আসবে ?'

পরমা লিখেছিল, 'এ প্রশ্নের উত্তর তুমিই দিতে পারো। আমাকে না জানিয়ে তাকে খবর দিয়ে আনানো কি এতই কঠিন কাজ ?'

সুশোভন বলেছিলেন, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না ?'

পরমা লিখেছিল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা থাক। আজ থেকে তুমি আর বেড়াতে বেরুবে না।'

মনে পড়ে ফাদার টারমোর তাঁদের কথার মধ্যে একটা কথাও বলেন নি ; চুপচাপ বসে ছিলেন। তবে মিশনে ফেরার সময় সুশোভনকে একধারে ডেকে ফিসফিস গলায় বলেছিলেন, 'শেরমুণ্ডা শহরের অনেকেই তোমাকে মেয়েটার সঙ্গে বেড়াতে দেখেছে, আমি নিজেও দেখেছি। তবে এসব কথা বৌমাকে কখনও বলি নি। সুশোভন— মাই চাইল্ড, বৌমা খুব বেশী দিন হয়ত আমাদের মধ্যে থাকবে না ; আমার অনুরোধ যে ক'টা দিন সে বাঁচে তাকে কষ্ট দিও না।'

ফাদারের শান্ত নিরুত্তেজ কথা বলার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ধিক্কার মেশানো ছিল। সুশোভন মুখ নীচু করে ভাঙা গলায় বলেছিলেন, 'আমি আর বাংলো থেকে বেরুব না ফাদার।'

'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড।'

এর পর তিন চার দিন বাংলো থেকে আর বার হন নি সুশোভন। কিন্তু বিকেল হলেই কোন ডাকিনী যেন মন্ত্র পড়ে নর্থ পয়েন্টের দিকে তাঁকে ডাকতে থাকত। তবে যাওয়া সম্ভব ছিল না ; কারণ পরমা তাঁকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছিল।

সুশোভন ভাবতেন, সব কিছু ভেঙেচুরে সুচেতার কাছে চলে

যাবেন : পরক্ষণে দারুণ এক পাপবোধ তাঁকে ক্লান্ত করে তুলত। জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে মনে মনে তিনি বলতেন, 'হ্যা, ঈশ্বর, আমি একটা মানুষ—আমি একটা মানুষ।'

মনে পড়ে, তিন চার দিন পর এক সন্ধ্যেবেলায় পরমা আর তিনি বারান্দায় বসে ছিলেন ; হঠাৎ একটা টাঙ্গায় করে সুচেতা এসে হাজির। তাকে দেখে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সুশোভনের।

সুচেতা সোজা এসে পরমার মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়েছিল। তারপর বলেছিল, 'কেমন আছেন পরমাদি ?'

পরমা সেই মুহূর্তে খাতায় লেখার কথা ভুলে গিয়ে নিজের অজান্তে একটা কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল। তার গলা দিয়ে অবরুদ্ধ গোঙানির মতো অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এসেছিল শুধু। তার ঘোলাটে জ্যোতিহীন চোখে শরীরের সব রক্ত জমা হয়েছিল যেন। মনে হয়েছিল যে কোন মুহূর্তে সে তুটো ফেটে যাবে।

এবার সুশোভনের দিকে ফিরে সুচেতা বলেছিল, 'কি হল, তিন চার দিন ধরে দেখা হচ্ছে না যে ! পরমাদি কি ছাড়ছে না ?' তার ঠোঁটে এবং চোখে আগুনের হল্কার মতো একটু হাসি খেলে গিয়েছিল।

সুশোভনের মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে গেছে। ধসে-পড়া ভাঙা গলায় তিনি শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'আমি—আমি—আমি—'

পরমা এবার তার খাতায় লিখে সুচেতাকে দেখিয়েছিল, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আর কক্ষনো এ বাড়িতে ঢুকবে না।'

সুচেতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আগুনের হল্কার মতো সেই হাসিটা ছড়িয়ে দ্রুত একবার সুশোভনকে দেখেই চলে গিয়েছিল। সে চলে যাবার পর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল পরমা। চিৎকার করে কিছু একটু বলতে চেয়েছিল ; বোঝা যায় নি। তবে তার ঠোঁট নাড়া দেখে মনে হয়েছিল সে যেন বলতে চেয়েছে, 'তুমি না বলেছিলে সুচেতার সঙ্গে তোমার দেখা হয় না ! মিথ্যেবাদী, লম্পট, দুশ্চরিত্র !'

সুশোভন দু-হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করো পরমা। তুমি উত্তেজিত হয়ো না ; শরীর আরো খারাপ হবে।'

পরমা তাঁর কথা শুনছিল না। দু-হাতে সুশোভনকে টানতে টানতে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। লচ্ছু এর মধ্যেই সেখানে একটা লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেছে।

পরমার গায়ে সেদিন যেন এক অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল। দৌড়ে দৌড়ে ঘরের সবগুলো দরজা আর জানলা বন্ধ করে সোজা সুশোভনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর সুশোভন কিছু বুঝবার বা বলবার আগেই শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, পেটিকোট খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চিৎকার করে যেন বলতে চেয়েছে, 'দেখ, ভালো করে দেখ। আমি কি সুচেতার চেয়ে কম সুন্দর? আমার শরীরে আকর্ষণ করার মতো কি কিছুই নেই? এসো, এসো আমার সঙ্গে—' শরীরের সবটুকু শক্তি দুই হাতে জড়ো করে টেনে সুশোভনকে সে বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল।

সুশোভন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, 'কী পাগলামি করছ পরমা! তোমার শরীর যে অসুস্থ—'

পরমা চিৎকার করে বলতে চেয়েছে, 'আমি তোমার কোন কথা শুনব না।' হাত বাড়িয়ে সে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ে পরের দিন আশ্চর্য শান্ত হয়ে গিয়েছিল পরমা। আগের রাত্রে নিজের শরীর আর মনের ওপর সে একটা ঝড় ডেকে এনেছিল; প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সব যেমন স্থির নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়, পরমাকে ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছিল।

বারান্দায় পাশাপাশি বসে ছোটনাগপুর রেঞ্জের আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট রেখা দেখতে দেখতে পরমা তার খাতায় লিখেছিল, 'একটা কথা ভেবে দেখলাম, বেশী দিন আমি আর বাঁচব না; কিন্তু তুমি তার পরেও অনেকদিন বেঁচে থাকবে। কত আর বয়স তোমার, মোটে চুয়াল্লিশ। আমি মরে গেলে তুমি সুচেতাকে বিয়ে কোরো! সত্যিই তো আমার জন্য তোমার জীবন নষ্ট হবে কেন?' লিখে খাতাটা সুশোভনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

পড়ে চমকে উঠেছিলেন সুশোভন, 'পরমা, আমি অন্যায় করেছি,

জঘন্য অন্যায়। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না?'

পরমা লিখেছিল, 'কাল পর্যন্ত আমার কষ্ট ছিল; আজ আর কোন দুঃখ নেই। বিশ্বাস কর, আমি মন থেকে বলছি তুমি সুচেতাকে বিয়ে কোরো।'

সুশোভন পরম স্নেহে পরমার রোগা একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি আর ও কথা বোলো না।'

মনে আছে সেদিন বিকেলে পরমা তার খাতায় লিখে দেখিয়েছিল, 'সুচেতার কাছে যাও। কাল তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলাম। তাকে বোলো আমি ক্ষমা চেয়েছি।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'ওসব কথা থাক।' তিনি সুচেতার কাছে যান নি। ঘর থেকে রেকর্ডপ্লেয়ারটা বার করে এনে অতুলপ্রসাদের সেই গানটা বাজিয়েছিলেন, 'ওগো নিঠুর দরদী, আমায় নিয়ে খেলছ অনুক্ষণ—'

শুনতে শুনতে পরমার জ্যোতিহীন ঘোলাটে চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

মনে আছে, তার পরের দিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সুশোভন বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই তাঁর, কিন্তু পরমাকে নিয়ে শেরমুণ্ডায় আসার পর সময় কাটাবার জন্যই দুপুরে এক ঘুম দিয়ে নিতেন। পরমাও দুপুরে একটু ঘুমুতো।

যাই হোক, সেদিন দিবানিদ্রাটা একটু তাড়াতাড়িই ভেঙে গিয়েছিল সুশোভনের। জেগে উঠে তিনি দেখেছিলেন পরমা পাশে নেই। ভেবেছিলেন বাথরুমে কিংবা বাইরের বারান্দায় হয়ত গেছে। অনেকক্ষণ তার সাড়াশব্দ না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলেন সুশোভন কিন্তু সারা বাংলো তোলপাড় করেও তাকে পাওয়া যায় নি।

কোথায় যেতে পারে পরমা? দুর্বল অসুস্থ শরীর নিয়ে কতদূর যাওয়া সম্ভব তার পক্ষে? সে কি সুচেতার কাছে গেছে? আরেকটা সম্ভাবনার কথাও বিদ্যুৎচমকের মতো সুশোভনের মনে পড়েছিল; পরমা কি আত্মহত্যার জন্য বেরিয়ে পড়েছে?

সুশোভন আর একমুহূর্তও বাংলোয় থাকেন নি; পরমার খোঁজে

বেরিয়ে পড়েছিলেন। বেশি দূর যেতে হয় নি, বাংলোর ওধারে উতরাইতে নামতেই চোখে পড়েছিল পরমা একটা টাঙ্গায় করে ফিরে আসছে। সুশোভন দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

কাছাকাছি এসে টাঙ্গা থামিয়ে নেমে পড়েছিল পরমা। সুশোভন অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'এ কি, আমাকে না বলে তুমি বেরিয়ে পড়েছিলে!'

পরমা মিষ্টি করে হেসেছিল, ইঙ্গিতে বলেছিল, 'বাংলোতে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'আমাকে বললে না কেন? আমি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম।'

পরমা ইঙ্গিতে জানিয়েছিল, 'তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে যে। তাই আর ডাকি নি।'

বাংলোর দিকে পরমাকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে সুশোভন বলেছিলেন, 'তোমার রোগা শরীর; রাস্তায় যদি কোন বিপদ-টিপদ হত!'

পরমা হেসেছিল।

মনে পড়ে বাংলোয় ফিরে সেদিন এক কাণ্ডই করেছিল পরমা। লিখে জানিয়েছিল, 'অনেকদিন তোমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াই নি। আজ বড্ড রাঁধতে ইচ্ছে করছে।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'না, কিছুতেই না। এই শরীরে তোমাকে রাঁধতে হবে না।'

পরমা শোনে নি; গাছকোমর বেঁধে রান্নাবান্না করে কাছে বসে সুশোভনকে খাইয়েছিল। তারপর নিজে খেয়ে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে দারুণ সেজেছিল। খোঁপায় ফুল গুঁজেছিল সে; পান খেয়ে ঠোঁট টুকটুকে করে তুলেছিল। রাত্তিরে সুশোভনকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে গাঢ় একটি চুমু খেয়ে ইঙ্গিতে বলেছিল, 'আমি মরে গেলে আমাকে ভুলে যাবে না?'

পরমার এই আচরণগুলো সেদিন ঠিক বুঝতে পারেন নি সুশোভন। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'ছিঃ, এ কথা বলতে নেই।'

পরমা আর কিছু করে নি ; সুশোভনের বুকে মাথা রেখে জোরে শ্বাস টেনেছিল।

মনে পড়ে, পরের দিন সকালে পরমাকে ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় নি। তার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন সুশোভন। গাটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

তক্ষুনি ফাদার টারমোরকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ফাদার তখন মিশনে ছিলেন না। তাই ছনিয়া স্টেশনের কাছ থেকে অন্য একজন ডাক্তার নিয়ে এসেছিল।

ডাক্তার পরমার পালস টিপেই বলেছিল, 'শী ইজ ডেড।' একটু থেমে বলেছিল, 'আমি এর চিকিৎসা করি নি ; ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারব না।'

পুলিশ কিভাবে খবর পেয়েছিল, তারাই জানে। খুব সম্ভব ডাক্তারই খবরটা দিয়ে থাকবে। মৃত্যুটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় নি।

পুলিসও এ মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মনে করেছিল। তারা এসেই সারা বাংলো ওলট-পালট করে খোঁজাখুঁজি চালিয়েছিল এবং পরমার একটা চিঠিও কোত্থেকে বার করে ফেলেছে। তাতে লেখা ছিল ঃ 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

মনে পড়ে, তিন ঘণ্টা বাদে পরমার চিঠিটা আর ডেডবডি নিয়ে পুলিস চলে গিয়েছিল। যাবার আগে সুশোভনকে বলেছিল, শেরমুণ্ডা শহর ছেড়ে আপাতত তিনি যেন কোথাও না যান।

পরমার মৃত্যুর খবর পেয়ে কলকাতা থেকে বাড়ির সবাই চলে এসেছিল। সুশোভন কারো সঙ্গে কোন কথা বলেন নি, চুপচাপ একটা মূর্তির মতো সারাদিন বাইরের বারান্দায় বসে থাকতেন।

মনে আছে, তিন দিন পর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল। পরমার স্টমাকে বিষ রয়েছে। মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

সুশোভন ভেবে পান নি, পরমা কিভাবে কোত্থেকে বিষটা যোগাড় করেছে। তবে কি সেদিন দুপুরবেলা যখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন সেই ফাঁকে সে বিষ যোগাড় করতে গিয়েছিল ?

যাই হোক, পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা বেরুবার পরই পুলিস এসে তাঁকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ে, অ্যারেস্টের দিন শেরমুণ্ডার সব লোক তাঁদের বাংলোর সামনে ভেঙে পড়েছিল। কি করে যেন রটে গিয়েছিল সুশোভনই হত্যাকারী; অন্য একটি মেয়েকে পাবার জন্য স্ত্রীকে তিনিই বিষটা খাইয়েছেন। সুশোভনকে যখন পুলিসের ভ্যানে তোলা হয় তখন শেরমুণ্ডার ক্রুদ্ধ মানুষ তার গায়ে থুথু ছিটিয়েছিল আর সমানে ঢিল ছুঁড়েছিল। ভাই এবং তাদের স্ত্রীদের মনোভাব বোঝা যায় নি। হয়ত তারা তাঁকে হত্যাকারী ভেবেছিল, হয়ত ভাবে নি। শুধু ফাদার টারমোর বিষণ্ণ গলায় বলেছিলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই বয়—'

এর পর কোর্টে কেস উঠেছিল। অমরেশরা ভালো ব্যারিস্টার দিতে চেয়েছিলেন; সুশোভন রাজী হন নি। তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন পরমার মৃত্যুর সব দায়িত্ব নিজেই নেবেন। সুশোভনের স্থির বিশ্বাস সুচেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাই এই মৃত্যুর কারণ; তিনিই পরমাকে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন।

আদালতে দাঁড়িয়ে সুশোভন স্বীকারোক্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমিই পরমাকে বিষ খাইয়েছি। তার আগে জোর করে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'—এই চিঠি লিখিয়ে নিয়েছি।'

সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে পরিষ্কার স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও বিচারকের সন্দেহ হয়ে থাকবে। তিনি সুশোভনকে বলেছিলেন, 'ভালো করে ভেবে বলুন।'

সুশোভন বলেছিলেন, 'ভেবেই বলেছি মী লর্ড।'

'আপনার কনফেসনের জন্য কী শাস্তি হতে পারে, ধারণা আছে?'

'আছে মী লর্ড। যে কোন শাস্তির জন্য আমি প্রস্তুত।'

আদালত সুশোভনকে বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিল।

বিচারকের রায় পড়া হয়ে যাবার পর কাঠগড়া থেকে পুলিসরা যখন সুশোভনকে নামিয়ে আনছে সেই সময় ফাদার টারমোর তাঁর কাছে দৌড়ে এসেছিলেন। বিচার চলার সময় তিনি রোজ কোর্টে

আসতেন। ফাদার টারমোর বলেছিলেন, 'মাই চাইল্ড, আমি জানি তুমি খুন কর নি ; তবু খুনের দায়িত্বটা নিচ্ছ। জীবনে যে ভুলটুকু করেছ তার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল।'

সুশোভন উত্তর দেন নি ; তাঁর চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

ফাদার টারমোর বলেছিলেন, 'মানুষ তো ঈশ্বর না ; তার ভুল হবেই। সেই ভুলের স্বীকারোক্তি এবং প্রায়শ্চিত্তও মানুষেরই কাজ। তুমি তা-ই করলে।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'একটা কথা তোমাকে এখনই বলে রাখি, আমাদের সোসাইটি বড় নির্মম। জেলখানা থেকে বারো বছর বাদে বেরিয়ে এসে কোথাও যদি জায়গা না পাও আমার কাছে চলে এসো। আমার দরজা চিরদিনই তোমার জন্য খোলা থাকবে।'

সুশোভন এবারও কোন উত্তর দিতে পারেন নি ; তাঁর ঠোঁটদুটো কেঁপেছিল শুধু।

পুলিসরা এর পর তাঁকে জেলে নিয়ে গিয়েছিল।

সুশোভনের মনে আছে, রায় বেরুবার দু-দিন বাদে মানেকলাল মেহতা জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। চুক চুক করে জিভের ডগায় অদ্ভুত শব্দ করে বলেছিল, 'আপনার মতো একজন সৎ মানুষকে শেষ পর্যন্ত এখানে নেমে আসতে হল। খুবই আপসোসের কথা স্যার। আই রিয়েলি ফীল ফর ইউ।' একটু থেমে কি ভেবে আবার বলেছিল, 'আমার কথা তো শুনলেন না ; শুনলে আপনার এই অবস্থা হত না।'

সুশোভনের কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল। মানেকলালের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কী বলতে চান আপনি ?'

লোহার গরাদের এপাশে সুশোভন, বাইরে মানেকলাল। মানেক-লাল মুখটা কাছে এনে চাপা গলায় বলেছিল, 'বলতে চাই আপনাকে এই জেলখানায় আমিই পাঠিয়েছি।'

সুশোভন চমকে উঠেছিলেন, 'তার মানে ?'

'পার্ক স্ট্রীটের ওধারে যখন 'রেইড' শুরু করলেন তখন আমার ক্লায়েন্টদের বাদ দিতে অনুরোধ করেছিলাম। আপনি শুনলেন না। তখন বাধ্য হয়ে সুচেতাকে আপনার পেছনে লাগাতে হল।'

'সুচেতা আপনার—'

মানেকলাল বলেছিল, 'আমার এজেন্ট। খুব অদ্ভুত লাগছে, না?'

সুশোভন বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিলেন; কিছু বলেন নি।

মানেকলাল আবার বলেছিল, 'ভেবেছিলাম সুচেতার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে একটা স্ক্যাণ্ডাল তৈরি করব; তারপর আপনার পুরো ক্যারেক্টার অ্যাসঅ্যাসিনেসন মানে চরিত্রহনন করে এমন একটা অ্যাটমসফীয়ার বানিয়ে ফেলব যাতে চাকরি আর না করতে পারেন। কিন্তু সুচেতার সঙ্গে আপনার ইন্টিম্যাসির ফলে আপনার স্ত্রী বিষ খেলেন, এটা অন্তত চাইনি। আমি দুঃখিত।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষীই ছিলাম। আপনার ভালোর জন্যে বার বার এগিয়ে গেছি; উলটে আপনি আমার ক্ষতিই করেছেন। যাই হোক, জেলে আপনার বারোটা বছর সুখে-শান্তিতে কাটুক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।'

সুশোভন চুপ করে ছিলেন।

মানেকলাল আবার বলেছিল, 'ছোট মুখে একটা বড় কথা বলে যাই স্যার, পৃথিবীতে খুব বেশী সৎ হওয়া ভালো না। আশা করি, কথাটা মনে রাখবেন। আচ্ছা নমস্কার।'

মানেকলাল চলে গিয়েছিল। তারপরও অনেকক্ষণ লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুশোভন।

মনে পড়ে জেলে থাকার সময় অমরেশ সমরেশরা প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করত। পরে তাদের যাওয়াটা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে কে একটি অচেনা মহিলা বার বার তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলে আসত; সুশোভন তার সঙ্গে দেখা করেন নি।

জেলখানায় সদাচরণ এবং ভদ্রভাবে থাকার জন্য বারো বছর কারাদণ্ডের মেয়াদ আট বছরে নেমে এসেছিল। আট বছর পর আজ তিনি মুক্তি পেয়েছেন।······

অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে কখন যে রাত ভোর হয়ে

এসেছে, খেয়াল ছিল না সুশোভনের। হঠাৎ বাগানের ঝুপসি আমগাছটার মাথায় রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজে চমকে উঠলেন।

বাইরে তাকাতেই সুশোভনের চোখে পড়ল, এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ছোট বড় পোখরাজের দানার মতো অগুনতি তারা আকাশ-ময় এখনও ছড়ানো।

মাঝরাত পর্যন্ত হুল্লোড়ের পর বিয়েবাড়িটা ক্লান্ত হয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে। কোথায়ও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। চারদিক নিঝুম।

সুশোভন ভাবলেন বাড়ির কেউ জেগে উঠবার আগেই চলে যাবেন। খাটের ওপর চেকবই আর সেই কোটটা পড়ে ছিল। কোটটা গায়ে দিয়ে চেকবই পকেটে ফেলে সুশোভন উঠে পড়লেন। তারপর দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে বারান্দায় সুধাকে দেখে চমকে উঠলেন।

এক ধারে রেলিঙে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল সুধা; সুশোভনকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

সুশোভন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'সুধা, তুমি এখানে!'

সুধা আবছা গলায় বলল, 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

একটু চুপ। তারপর সুশোভন বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

সুধা বলল, 'আমি জানতাম। সে জন্যেই তো বসে ছিলাম।'

হঠাৎ কি মনে হতেই সুশোভন ব্যস্তভাবে বললেন, 'তুমি কি সারারাত এখানে বসেছিল?'

'হ্যাঁ।' বলে একটু থামল সুধা। তারপর ভাঙাগলায় বলল, 'আপনি এ বাড়ি থেকে চিরকালের জন্য চলে যাবেন; যাওয়ার আগে একটু দেখা হবে না! তাই—' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর বুজে গেল। তারপর নীচু হয়ে সুশোভনকে প্রণাম করল সে।

সুশোভন বললেন, 'ভালো থেকো।' বলে আর দাঁড়ালেন না। বারান্দা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে এলেন; সেখান থেকে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নীচের বাগানে নামতে লাগলেন।

একটু পর পেছনের বাগান থেকে বাড়ির সামনের দিকের সবুজ মাঠে চলে এলেন সুশোভন। ও ধারের প্যাণ্ডেলে এখনও আলো-টালো জ্বলছে। খাবার টেবিলগুলো জোড়া লাগিয়ে বাড়ির চাকর-বাকরেরা চাদর মুড়ি দিয়ে তার ওপর ঘুমোচ্ছে। গেটের ওপর উঁচু মঞ্চ বানিয়ে যে সুসজ্জিত নহবতখানা বসানো হয়েছে সেখানে সানাইওলা এবং তার সঙ্গী বাজনদারেরা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। গোটাকতক রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরকেও এধারে ওধারে কুঁকড়ে-মুকড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

গেটের বাইরে এসে সুশোভন শেষ বারের মতো বাড়িটাকে দেখে নিলেন। চারদিক কুয়াশায় অস্পষ্ট। তারই মধ্যে ঝাপসা হয়ে আসা কোন ছবির মতো দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সুধা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখলেন সুশোভন। তারপর আস্তে আস্তে বি. টি. রোডে চলে এলেন।

এখনও ভালো করে ভোর হয় নি। আকাশের গায়ে আবছামতো একটু আলোর ছোপ ধরেছে মাত্র। বাস-টাসও রাস্তায় বেরোয় নি। মিল্ক সাপ্লাইয়ের দু-চারটে ভ্যান, নানা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুশোভন বাসের জন্য দাঁড়ালেন না। শ্যামবাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দূরমনস্কর মতো ভাবতে লাগলেন, বুবুনের সঙ্গে একবার দেখা করবেন। সেজন্য ওর মামাবাড়ি ওল্ড বালিগঞ্জে একবার যাওয়া দরকার।

জেলে যাবার পর থেকে পরমার মা-বাবা বা ভাইদের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ ছিল না সুশোভনের। তবে পরমার মৃত্যুর খবর পেয়ে ওঁরা শেরমুণ্ডায় এসেছিলেন ; কোর্টে কেস চলার সময়েও ছু-একবার ওঁদের দেখা গেছে। পরমার মৃত্যুর জন্য ওঁরা সুশোভনকে সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন। সুশোভন জানেন পরমার মা-বাবা এবং ভাইরা তাঁকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

ও বাড়িতে গেলে কী ধরনের ব্যবহার পাওয়া যাবে, সুশোভন জানেন। তবু যেতেই হবে। বুবুনের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। তাঁর সম্বন্ধে বুবুনের মনোভাব কী, সেটা জানতেই হবে।

শ্যামবাজার আসতেই সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে রোদ উঠে গেছে ; ট্রাম বাস চলতে শুরু করেছে। সুশোভন একটা বাসে উঠে পড়লেন।

যা প্রত্যাশিত ছিল ওল্ড বালিগঞ্জে আসতে তা-ই ঘটল।

পরমার মা-বাবা সুশোভনের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে তাঁর সামনে থেকে চলে গেলেন।

পরমার ছুই ভাই বলল, 'গেট আউট, গেট আউট। তোমার সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। এ বাড়িতে আবার দেখলে তোমার চামড়া তুলে নেব।'

হয়ত এই ব্যবহার তাঁর প্রাপ্য ছিল। সুশোভন প্রতিবাদ করলেন না ; শুধু বিষণ্ণ একটু হেসে বুবুনের দিকে ফিরলেন।

ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে বুবুনকে। এখন সে একুশ বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক। মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে সুশোভন বললেন, 'তুই আমাকে কিছু বলবি না ?'

ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধায় বুবুনের চোখ জ্বলছিল। সে বলল, 'আমি একটা মার্ডারারের ছেলে, এটা ভাবতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আত্মহত্যা করার সাহস আমার নেই। আপনি আর কখনও এখানে আসবেন না।'

ক্লান্ত দুর্বল স্বরে সুশোভন বললেন, 'ঠিক আছে, আসব না। তুই ভালো থাকিস।'

ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে লক্ষ্যহীনের মতো রাস্তায় রাস্তায় দুপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন সুশোভন। এখন তিনি কোথায় যাবেন? কার কাছে যাবেন? ভাবতে ভাবতে ফাদার টারমোরের কথা মনে পড়ে গেল।

আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না সুশোভন। পকেটে চেক-বইটা ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন। সেখান থেকে শেরমুণ্ডার ট্রেন ধরবেন।

অনেক রাত্তিরে শেরমুণ্ডা মিশনে পৌঁছে সুশোভন দেখলেন ফাদার টারমোর একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন। তা ছাড়া এখন তিনি ভয়ানক অসুস্থও; প্রায় শয্যাশায়ীই।

ফাদারকে প্রণাম করে সুশোভন বললেন, 'জেল থেকে বেরুবার পর কোথাও জায়গা না পেয়ে আপনার কাছে চলে এসেছি। এখানে কি আশ্রয় পাব?'

ফাদার টারমোর স্নিগ্ধ হাসলেন। বয়সের ভারে শরীর দুমড়ে বেঁকে গেলেও মুখের হাসিটা আগের মতোই এখনও নিষ্পাপ আর পবিত্র। তিনি বললেন, 'মাই চাইল্ড, এ এমন একটা জায়গা যেখানে সবাই আশ্রয় পেতে পারে। তুমি এসেছ, আমি বেঁচে গেছি।'

ফাদার টারমোরের শেষ কথাগুলো বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলেন সুশোভন।

ফাদার বললেন, 'আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে; বুঝতেই পারছ বেশিদিন আর বাঁচব না। ভয় ছিল এই মিশনের ভার কার ওপর দিয়ে যাব। তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। ওলিম্পিক টর্চ তোমার হাতে দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব। এখন থেকে আমার শেষ, তোমার দৌড় শুরু। গড ব্লেস ইউ মাই বয়।'

সুশোভনের মনে পড়ল, বাবাও ঠিক এই কথাটাই তাঁকে একদিন বলেছিলেন। জীবনে কত বার কত জায়গা থেকে যে দৌড় শুরু করতে হয়, কে জানে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেছে। শেরমুণ্ডা মিশনের ফাদার টারমোর আর নেই কিন্তু সুশোভন আছেন। পরম যত্নে ফাদারের দেওয়া সেই ওলিম্পিকের আগুনকে তিনি রক্ষা করে চলেছেন ; এক মুহূর্তের জন্য তিনি তাকে নিভতে দেন নি।

ফাদার টারমোরের সময় অরফ্যানেজ আর মিশন যত বড় ছিল এখন তার চার পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, গভর্নমেণ্ট—সব জায়গা থেকে ডোনেসন আর সাহায্য নিয়ে সুশোভন মিশনকে বড় করে তুলেছেন। সারাদিন এখন তাঁর কাজ আর কাজ। অনাথ বালকদের দেশের নানা জায়গা থেকে কুড়িয়ে এনে তিনি মানুষ করছেন, লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তারপর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন।

শেরমুণ্ডা মিশনের নাম এখন সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে, আর ছড়িয়েছে সুশোভনের খ্যাতি।

পরমার মৃত্যুর পর শেরমুণ্ডার যে মানুষেরা একদিন সুশোভনের গায়ে থুতু ছিটিয়েছিল, ইট ছুঁড়েছিল, এখন তারাই তাঁকে ঈশ্বর মনে করে। মানুষের অজস্র ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা নিজের ক্ষমতায় তিনি আদায় করে নিয়েছেন।

এখানে আসার কত দিন পর সুশোভনের মনে পড়ে না, গভর্নমেন্ট ঠিক করল সেবামূলক কাজের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে। দুটো বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুশোভন এদের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক সম্মানের প্রয়োজন তাঁর নেই। তা ছাড়া মিশন ছেড়ে, এখানকার ছোট ছোট অনাথ শিশুদের ছেড়ে শুধুমাত্র সম্মানিত হবার জন্য তিনি কোথাও যাবেন না। কারো কাছেই তাঁর ব্যক্তিগত প্রার্থনা বা প্রত্যাশা নেই। কিন্তু যারা তাঁকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাতে চায় তারা ছাড়ে নি। ঠিক করেছে এই শেরমুণ্ডা শহরে এসেই তাঁকে সম্মান জানাবে।

আজ সেই সম্মান জানাবার দিন। মিশনের ভেতরকার মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরি করা হয়েছে। অজস্র ফুলে আর পাতায় প্যাণ্ডেলটা সাজানো।

এই উপলক্ষে দুজন মন্ত্রী এসেছেন, এসেছেন বড় বড় সরকারী অফিসাররা এবং চার পাশের যত মানুষ। কলকাতা, দিল্লী আর পাটনা থেকেও অনেকে এসেছেন। এ ছাড়া এসেছে খবরের কাগজ এবং রেডিওর লোকেরা।

সুসজ্জিত মঞ্চে সুশোভনকে বসানো হয়েছে। বিশিষ্ট বক্তা এবং মন্ত্রীরা তাঁর সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। তারপর মানপত্র এবং ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হল।

একসময় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল; মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট

মানুষেরা একে একে চলে গেলেন। প্যাণ্ডেল যখন ফাঁকা হয়ে এসেছে সেই সময় সুশোভন অরফ্যানেজে তাঁর ঘরের দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, একদিন ধিক্কৃত হয়েই এ শহর থেকে তিনি জেলখানায় চলে গিয়েছিলেন। আবার এ শহরই আজ তাঁকে দু-হাত ভরে অজস্র সম্মান ফিরিয়ে দিল। এই সম্মান তাঁর ভালোও লাগছে না, আবার খারাপও না। ভালো-মন্দ সম্মান-অসম্মান তিনি আজ সব কিছুর বাইরে। মিশনে থাকতে থাকতে জীবন কি আশ্চর্য ভাবেই না তাঁর সব মোহ আর আসক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

প্যাণ্ডেলের পেছন দিকের মাঠে যেখানে যীশু খ্রীস্টের বিরাট মূর্তিটা রয়েছে তার কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন সুশোভন। হঠাৎ পেছন থেকে কে ডেকে উঠল, 'একটু শুনবেন—'

পেছন ফিরতেই চমকে উঠলেন সুশোভন। খানিকটা দূরে সুচেতা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তার! সমস্ত শরীর যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। চোখ গর্তে ঢোকানো, চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠ, গায়ের চামড়ায় দাগড়া দাগড়া কালচে ছাপ। ওগুলো কিসের শীল-মোহর সুশোভন জানেন।

একদিন সুচেতাকে দেখার জন্য উন্মাদ হয়ে যেতেন সুশোভন। কিন্তু আজ তাকে দেখে অনুভূতিতে একটা ঢেউও উঠল না। তবে এখানে আজ সুচেতাকে দেখবেন, ভাবেন নি। একটু বিমূঢ় হয়েই তিনি বললেন, 'আপনি এখানে!'

হঠাৎ দৌড়ে এগিয়ে এল সুচেতা। তারপরই তার শরীরটা ভেঙে-চুরে সুশোভনের পায়ের কাছে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। কান্নাভাঙা জড়ানো গলায় সে বলতে লাগল, 'আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

নিজের অজান্তেই সুশোভন বলে ফেললেন, 'কেন, মানেকলাল মেহতা—'

'ওরা আমাকে শেষ করে দিয়েছে।'

সুশোভন চুপ করে রইলেন।

সুচেতা আবার বলল, 'আমরা খুব গরীব ; তবে দেখতে খারাপ ছিলাম না। মানেকলাল চাকরি দেবার নাম করে নানা লোকের পেছনে আমাকে লাগিয়ে তাদের, সেই সঙ্গে আমারও সর্বনাশ করেছে। তারপর শরীর যখন নষ্ট হয়ে গেল তখন তাড়িয়ে দিল। একটু থেমে বলতে লাগল, আমার জন্যই পরমাদি বিষ খেয়েছে, আপনি জেল খেটেছেন। তবু এখানে আসা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।'

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাও তুমি ?'

'একটু আশ্রয়।'

সুশোভন ভাবলেন আজ তিনি যেখানে পৌঁছেছেন সুচেতার সাধ্য নেই তাঁর গায়ে কাদা ছিটোতে পারে। কোন গ্লানিই আজ তাঁকে ছুঁতে পারবে না। সুশোভন বললেন, 'ঠিক আছে, মিশনের অফিসে দেবব্রতবাবু আছেন। তাঁকে আমার নাম করে বল, সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সুচেতা সুশোভনের দু-পায়ে অনেকক্ষণ মুখ রেখে প্রণাম করল। সুশোভন অনুভব করলেন, তাঁর পা জলে ভিজে গেছে।

একসময় সুচেতা উঠে দাঁড়িয়ে অফিস ঘরের দিকে চলে গেল। সুশোভন আবার হাঁটতে শুরু করলেন কিন্তু আবারও বাধা পড়ল। পেছন থেকে চেনা গলার ডাক শোনা গেল, 'দাদা—'

এবার ঘুরে দাঁড়াতেই অমরেশ সমরেশ দিবাকর আর বুবুনকে দেখতে পেলেন সুশোভন। নানা খবরের কাগজে কিছুদিন ধরে তাঁর সম্বন্ধে লেখালেখি হচ্ছে, তাঁর অনেক ছবি বেরিয়েছে, আজকের এই অনুষ্ঠানের কথাও ছাপা হয়েছে। নিশ্চয়ই সে-সব দেখে ওরা ত এখানে এসেছে। প্যাণ্ডেলেও হয়ত ওরা ছিল, অত মানুষের সুশোভন লক্ষ্য করেন নি।

সামান্য হেসে সুশোভন বললেন, 'তোরা ভালো আছি

'হ্যাঁ।' অমরেশ এগিয়ে এসে বলল, 'দাদা, তোমা খুব অন্যায় করেছি।'

'কিচ্ছু না রে—' সুশোভন মাথা নাড়লেন, 'অ

করে রাখি নি।'

বুবুন বলল, 'আমাদের তুমি ক্ষমা কর বাবা—'

'দূর বোকা; তোরা কী অন্যায় করেছিস যে ক্ষমার কথা বলছিস।' আলতো করে বুবুনের কাঁধে একটা হাত রাখলেন সুশোভন।

দিবাকর বলল, 'দাদা, তোমার অনেক বয়স হয়েছে, অনেক পরিশ্রম করেছ তুমি এই মিশনের জন্য। আমি বলছিলাম—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই সুশোভন গভীর গলায় দূরমনস্কর মতো বলে উঠলেন, 'কারো জন্যেই আমি কিছু করি নি; আমি যা করেছি সব নিজের জন্যে। এ ছাড়া আমার আর বাঁচবার উপায় ছিল না।'

দিবাকর তার আগের কথাটাই আবার বলল, 'দাদা, আমি বলছিলাম, তোমার এখন বিশ্রামের দরকার। তোমাকে আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

সুশোভন বললেন, 'আমি এইখানেই বেশ আছি দিবু।'

অমরেশরা চলে গেছে। এখন অরফ্যানেজে নিজের ঘরে বসে চার্চের মাথায় কাঠের বিরাট ক্রুশটা দেখতে দেখতে সুশোভন আজকের দিনটার কথা ভাবছিলেন। সুচেতা তাঁর ক্ষতি করেছিল, সে এসে আশ্রয় চেয়েছে। অমরেশরা তাঁকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছিল; তারা আজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

সুশোভন খুব আপ্লুত হন নি, তেমন অভিভূতও না। ভাবছিলেন চু-লখানা থেকে বেরিয়ে একদিন তাঁর মনে হয়েছিল সব থেমে গেছে। টেকে কিছুই থামে না। কোন না কোন ধারায় জীবন নিরবধি

'আমার ও

নিজের

মেহতা—'

'ওরা আমা

সুশোভন চু